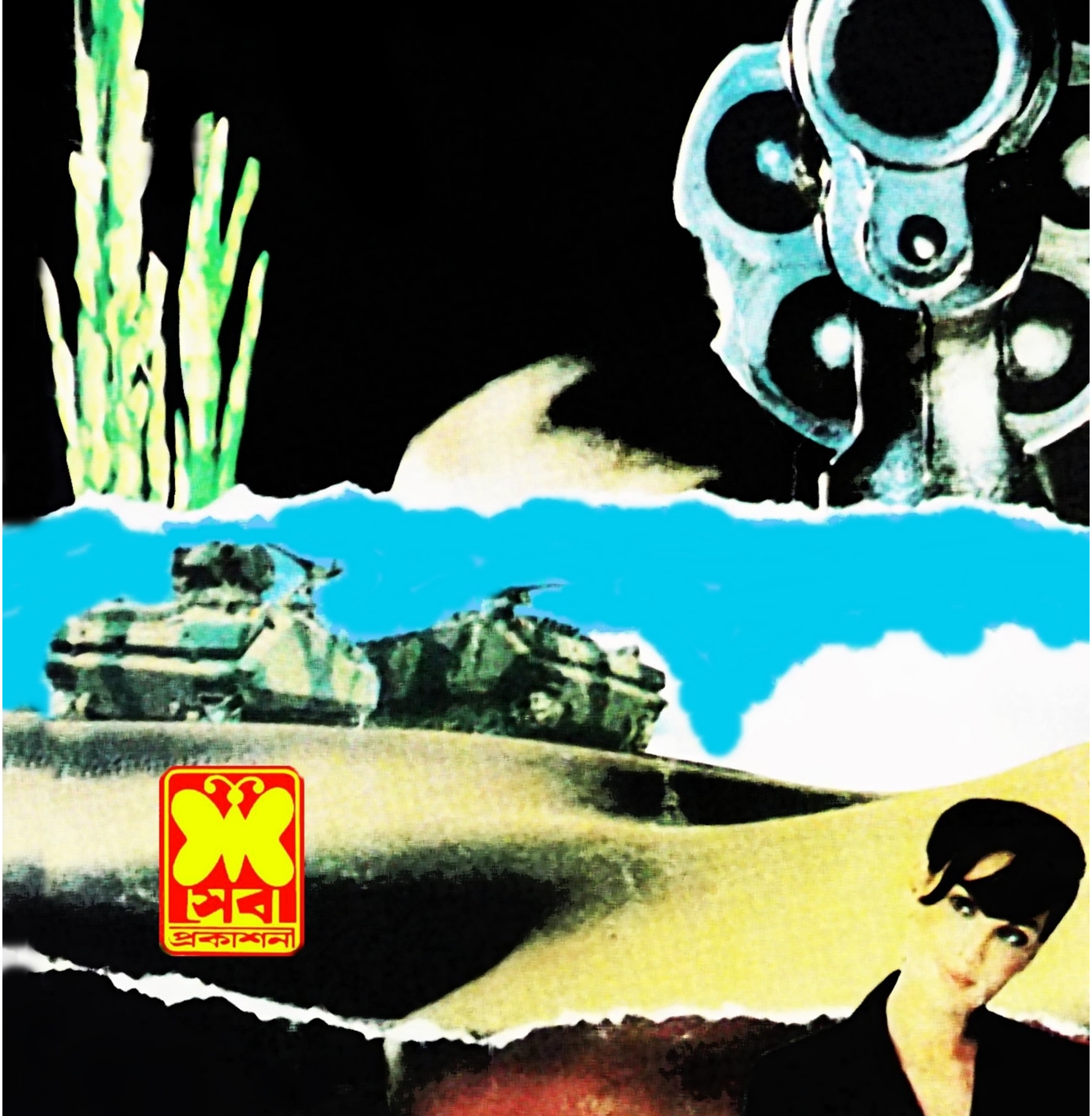
Rizon

মাসুদ রানা

মৃত্যুবীজ

কাজী আনোয়ার হোসেন




Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

মাসুদ রানা ৩২০

মৃত্যুবীজ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7320-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail. Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-320
MRITTYUBEEJ
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

উনত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা- অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ*বিপদসীমা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং সেভেন-ও-সেভেন ছুটছে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে, টার্গেট টকটকে লাল ছোট্ট একটা থালা, এখনও দেখা না গেলেও এখুনি দিগন্তরেখার ওপর উঠে আসবে।

আলো নেভানো ককপিটে বাম দিকের সিটে বসেছেন ক্যাপটেন মনির মাহফুজ, বোয়িং-এর বাঁকা নাকের ওপর দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলোকে ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি, সূর্যোদয় দেখার আশায় আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। ঠিক এই সময়টায় এক কাপ ধূমায়িত কফি পেতে খুব ইচ্ছে করে তাঁর, তবে তিনি জানেন ক্রুরা আজ সবাই এত ব্যস্ত যে কারও বোধহয় দম ফেলারও ফুরসত নেই। এবারের লন্ডন-টু-ঢাকা ফ্লাইটের প্রায় সব টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে। আরোহীরা বেশিরভাগই এশীয়। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস-এ অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ডেলিগেট এঁরা। ব্রাসেলস থেকে অন্য এক এয়ারলাইন্সের প্লেনে চড়ে লন্ডনে পৌঁছে বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং-এ ওঠেন। তালিকার প্রায় প্রতিটি নামের সঙ্গে একটা করে পি.এইচ.ডি. আছে। পাঁচ-সাত ঘণ্টা পর পর বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে রিফুয়েলিঙের জন্যে ল্যান্ড করবেন ক্যাপটেন। জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন ইন্টারকানেক্টিং ফ্লাইট ধরে নিজ নিজ দেশে

চলে যাবেন বিজ্ঞানীরা।

শুধু ধূমায়িত কফি নয়, সূর্যোদয়ের দেখার কথাও ভুলে গেলেন ক্যাপটেন মাহফুজ, কারণ অন্ধকার কন্ট্রোলরুমে এক ফালি আলো পড়েছে। সিটের ওপর খানিকটা ঘুরে বসলেন–শুধু বিরক্তি নয়, রীতিমত বিস্ময় বোধ করছেন। স্টুয়ার্ড খুব ভাল করেই জানে, আরোহী যত উঁচু স্তরের ভিআইপি-ই হন না কেন, ফ্লাইট ডেকে কাউকে আনতে হলে প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে। আর, তাছাড়া, এ-ধরনের লোকজনকে তো এখানে ঢুকতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কো-পাইলটের দিকে তাকাতে তার চোখেও শৃংখলা ভঙ্গজনিত বিরক্তি ও বিস্ময়ের ভাব লক্ষ করলেন তিনি। তারপর–মুহূর্তগুলো যেন নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী সময়, যখন মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই ঘটনাগুলো অনন্তকাল ধরে ঘটে চলেছে–তরুণ, সুদর্শন কো-পাইলটের মুখটা হঠাৎ কুৎসিত-কদাকার হয়ে উঠল; রক্ত, ছেঁড়া মাংস, টুকরো টুকরো সাদা হাড়ের সমষ্টি। ভাল করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্যাপটেন অনুভব করলেন পিছন থেকে কুসুমগরম তরল কি যেন তাঁর পিঠে পড়ল। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেলেন এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে রক্তের ধারা, ভিজিয়ে দিচ্ছে তাঁর পিঠের শার্ট।

কো-পাইলটকে কন্ট্রোলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে দেখলেন তিনি। প্লেন নিজস্ব কোর্সে স্থির থাকল, অটোমেটিক পাইলট আগে থেকেই দায়িত্ব পালন করছিল। ক্যাপটেন মাহফুজ হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠে খেয়াল করলেন, সাইলেন্সার লাগানো একটা হেভি ক্যালিবার পিস্তলের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি। পিস্তলের পিছনে দাঁড়ানো লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা, বয়স ত্রিশের কোঠায়, চোখ-মুখে রুক্ষ, কর্কশ ভাব। মাথায় পাগড়ি না থাকলেও, লোকটা ভারতীয় শিখ হলেও হতে পারে; আবার পাকিস্তানী পাঞ্জাবী হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে

ক্যাপটেন মাহফুজকে অবাক করে দিয়ে লোকটা পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'রেডিও ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন না, তাহলে ওদের মত আপনাকেও গুলি করব।'

ক্যাপটেন মাহফুজ কাপুরুষ নন। রেডিও অন করে প্লেন হাইজ্যাকের খবরটা প্রচার করার কথা ভাবলেন ঠিকই, তবে জানেন সে সুযোগ তাঁকে দেয়া হবে না। তাছাড়া, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথম বিবেচনা হলো আরোহীদের নিরাপত্তা; তিনি যদি গুলি খেয়ে মারা যান, প্লেনটা চালাবে কে?

বেঁটে আরেকজন নাদুসনুদুস লোককে দেখতে পেলেন ক্যাপটেন। এর হাতেও একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ছিল, এখন জ্যাকেটের কোনও পকেটে রেখে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্লাইট ডেকের মেঝেতে স্টুয়ার্ডের লাশটাও পড়ে থাকতে দেখেছেন তিনি, সম্ভবত এই বেঁটে লোকটাই তাকে খুন করেছে। এই মুহূর্তে সিট থেকে কো-পাইলটের লাশ সরাচ্ছে সে।

লম্বা লোকটা ক্যাপটেনের পিছনে দাঁড়িয়েছে, খুলির পিছনে মাজলের ছোট্ট বৃত্তের চাপ অনুভব করছেন তিনি। বেঁটে লোকটা কো-পাইলটের লাশ টেনে-হিঁচড়ে কেবিন থেকে বের করে নিয়ে গেল, খালি সিটটায় এসে বসল তার লম্বা সঙ্গী, পিস্তলটা এখনও ক্যাপটেনের দিকে তাক করা।

'কি করতে হবে বলছি, মন দিয়ে শুনবেন,' বলল সে। শান্ত গলা, হাসি হাসি মুখ। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে যেন মজার একটা খেলা বা কৌতুক। 'অটো পাইলট নয়, প্লেনটা এখন আপনি নিজে চালাবেন। আমি চাই খাড়া ডাইভ দেবে বোয়িং। কমবেশি এক হাজার ফুটে পৌঁছে লেভেলে আসবেন। তারপর ষাট ডিগ্রী ঘুরে নতুন কোর্স সেট করবেন।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না,' ক্যাপটেন বললেন। বুঝেছেন ঠিকই, হাইজ্যাকাররা চাইছে প্লেনটা খুব নিচ দিয়ে চালানো হোক, যাতে কোন রাডারে ধরা না পড়ে।

‘আপনার বোঝার কোন দরকার নেই,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল লোকটা, এখন আর হাসছে না। ‘মাথায় যাতে কোন কুবুদ্ধি না আসে, তাই দু’একটা কথা বলি। আপনাকে দয়া করে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, আসলে প্লেন চালানোর মত লোক আমাদের সঙ্গে আছে।’

‘আমার আর সব ক্রু কোথায়?’ প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন।

আবার হাসল লোকটা। ‘তাদেরকে কোথায় রাখা হয়েছে জানেন? ভিআইপি লাউঞ্জে। তাদেরকে মানে, বুঝতেই পারছেন, তাদের লাশগুলোকে। তবে আরোহী কারও গায়ে হাত দেয়া হয়নি। একটু হয়তো হতচকিত, এরকম পরিস্থিতিতে সেটা স্বাভাবিক, তবে সবাই বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছেন।’ পিস্তল নেড়ে ইঙ্গিত করল সে। ‘নিন, কাজে হাত দিন।’

‘কে আপনি?’ জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। ‘কি চান আপনারা?’

‘পিছন দিকে তাকান,’ কো-পাইলটের সিট থেকে বলল হাইজ্যাকারদের লীডার।

ক্যাপটেন পিছনে তাকিয়ে এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

‘মার্সেনারি তিউনিশিয়ান পাইলট,’ আবার বলল লোকটা। ‘আপনি যদি আর একটা ফালতু প্রশ্ন করেন, আপনার সিটে ওকে বসাব। বুঝতেই পারছেন, আপনি তখন ভিআইপি লাউঞ্জে থাকবেন।’

ক্যাপটেন মাহফুজ কন্ট্রোল প্যানেল টেনে এনে ডাইভ দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন।

প্যারিসে মাসুদ রানা কোন কাজ নিয়ে আসেনি, আবার ছুটি পেয়ে বেড়াতেও নয়। ‘যাও, পরিচয় গোপন করে প্যারিসে থাকো,’ ঢাকা হেডকোয়ার্টারে, নিজের চেম্বারে বসে, এই নির্দেশই

দিয়েছেন বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান তাঁর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্টকে। 'কয়েকটা ফোন নম্বর দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও, প্রতিদিন অন্তত একবার সোহেলের সঙ্গে কথা বলবে।'

আজ তিনদিন প্যারিসে রয়েছে রানা। ফোন করলেই সোহেল উল্টোপাল্টা জবাব দেয়, এই যেমন কাল বলেছে, 'তোকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই, মিশনটা তোর সাহায্য ছাড়াই সফল হতে যাচ্ছে। ভাবছি বসকে বলে তোকে ছাঁটাই করে দেব কিনা...'

'মিশনটা কি?' রানার প্রশ্নে বোকা-বোকা ভাব, ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর বিদ্রূপাত্মক খোঁচা নিরবে হজম করছে, ভেতরের গোপন খবর জানতে পাওয়ার আশায়।

তবে সোহেল আহমেদ ওর চেয়ে কম বুদ্ধিমান হলে কি বিসিআই-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদটি পেত? 'দুঃখিত, দোস্ত—চাকরি হারানোর ভয়ে তোর গলা এত নেমে গেছে যে কি বললি শুনতে পেলাম না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল।

বসন্তের প্রথম সন্ধেবেলা, গোটা প্যারিস আজ ফুলবাগান। কত বিচিত্র সৌরভে আর কোকিলের কুহুতানে ভারী হয়ে আছে দখিনা বাতাস। সানসেজ ভিকারিয়ো, মেক্সিকান প্লেবয়, এই পরিচয় দিয়ে ফাইভ স্টার স্যাভয় হোটেলে উঠেছে রানা, ডিনার খেয়ে পায়চারি করার অজুহাতে এলিসি প্রাসাদকে পিছনে ফেলে ফুটপাত ধরে হাঁটছে, উদ্দেশ্য নির্জন এলাকায় খালি একটা বুদ পেলে টেলিফোন করবে সোহেলকে।

বিশেষ করে নিঃসঙ্গ একটা কোকিলের ডাকে বিষাদের সুর এত বেশি, যতবার শুনছে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করছে রানা বুকে, মনে পড়ে যাচ্ছে তাজা গোলাপের স্নিগ্ধতা মাখা এক রমণীর মুখ, যে কি না বড় দুঃসময়ে এসেছিল ওর জীবনে, ওকে

ভুল বুঝে চিরকালের জন্যে ফিরেও গেছে–কেউ জানে না কোথায়। সেই মেয়েটির স্মৃতি ওকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে, বোধহয় সেজন্যেই ঝকঝকে নতুন মার্সিডিজ স্পোর্টস কনভার্টিব্‌ল গাড়িটা কিছুক্ষণ হলো ওর পাশে থাকলেও দ্বিতীয়বার ওটার দিকে তাকায়নি ও, ভেবেছে প্রায় নির্জন সাইড রোডে পার্ক করার ভাল একটা জায়গা খুঁজছে ড্রাইভার।

'শুভসন্ধ্যা, মসিয়ো।' মার্সিডিজ থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠের চটুল হাসি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। মিনি স্কার্টে ঢাকা পড়েনি ভরাট যৌবন, চোখের তারায় দুষ্ট-হাসির ঝিলিক গোপন করারও কোন চেষ্টা নেই, দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে ফুটপাতের কিনারায় দাঁড় করাল কনভার্টিবল, এঞ্জিন প্রায় নিঃশব্দে সচল থাকল।

'আমি বোধহয় আপনাকে কোথাও নামিয়ে দিতে পারি, মসিয়ো,' আবার বলল মেয়েটা, ইংরেজিতে ফরাসী টান।

'শুভসন্ধ্যা তোমাকেও,' বলল রানা, ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁত থেকে যেন মুক্তোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। 'কিন্তু না। আমি আসলে আমার গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছি।' প্যারিসের কুখ্যাত 'ট্যাক্সি গার্ল' সম্পর্কে শুনেছে ও, তবে জানা ছিল না তাদের মধ্যে এত সুন্দরী মেয়েও আছে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নেয়, এ মেয়েটিকে দেখে অবশ্যই ঈর্ষা বোধ করবে। সেজন্যেই সন্দেহ হচ্ছে আদৌ 'ট্যাক্সি গার্ল' কিনা।

মেয়েটার চোখে-মুখে হতাশার ছায়া পড়ল। 'আজ বসন্তের প্রথম দিন নয়? আপনার মনে হয় না, এমন দিনে একটা মেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করতে পারে?' তারপর, রানার মৌনতাকে সম্ভবত সিদ্ধান্তহীনতা ধরে নিয়ে আবার বলল, 'আপনি যতটা ভাবছেন অত খরচ না-ও হতে পারে...'

মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ফর্সা মুখটাকে শীতের রোদে পুড়িয়ে তামাটে করতে প্রচুর সময়, ধৈর্য ও খরচা

লেগেছে; বড় বড় চোখের সাদা জমিন এতটাই নির্মল যেন এই মেয়েকে কোন পাপ এখন পর্যন্ত স্পর্শ করেনি, চোয়ালের সুগঠিত হাড় অভিজাত বংশধারার সাক্ষ্য দেয়, আর নগ্ন কাঁধে জলপ্রপাতের মত নেমে আসা ঝলমলে সোনালি চুল রূপসীর গর্ব শতগুণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। রানা ভাবল, শিল্পীদের স্বর্গ প্যারিসে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটে; এ মেয়েটি হয়তো শহরের সবচেয়ে দামী 'ট্যাক্সি গার্ল'।

'তাছাড়া, মসিয়ো, আপনাকে দেখে আমার খুব রোমান্টিক আর ভদ্র মনে হচ্ছে,' বলল মেয়েটা, রানা আবার হাঁটতে শুরু করায় ওর গতির সঙ্গে তাল রেখে সে-ও গাড়ি ছাড়ল। 'আমি জানি, আপনার সঙ্গে আজ সময়টা বড় আনন্দে কাটবে আমার। পয়সা? যতটা পারি কম নেব...'

রানার সিদ্ধান্ত, চটুল হাসিটাও ওই মেয়ের নিজের নয়, ধার করা। স্বগতোক্তি করল–মিলছে না, হে, মিলছে না! 'হ্যাঁ, 'কথাটা ঠিক, সময়টা ভালই কাটত। কিন্তু দুঃখিত...'

বেশ্যার অশ্লীল ভঙ্গি নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল মেয়েটা, জিভের ডগা বের করে প্ররোচিত করতে চাইল। 'চলে আসুন, মসিয়ো, চলে আসুন। আমাকে বিশ ডলার দেবেন, আর কামরার ভাড়া পাঁচ ডলার। বলেন, পানির দর নয়?'

পচা ইঁদুরের অর্থাৎ বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রানা। প্যারিসে 'ট্যাক্সি গার্ল'-এর সঙ্গ পেতে হলে অন্তত একশো মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ ফ্রাঙ্ক খসাতে হবে, আর এই মেয়েটির তো পাঁচশো ডলারের কম চাওয়াই উচিত নয়। তাছাড়া, একটা বেশ্যার চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের ঝিলিক থাকে না, এই মেয়েটির মধ্যে যেমনটি দেখা যাচ্ছে। হাসল রানা। 'থ্যাঙ্কস, বাট নো থ্যাঙ্কস।'

চোখ দুটো দপ করে যেন জ্বলে উঠল মেয়েটার। 'আপনি তো দেখছি নেহাতই একটা বোকা লোক! একবার ভেবে দেখছেন না কি হারাতে যাচ্ছেন?' ইংরেজি নয়, ফ্রেঞ্চ ভাষায় ঝাল ঝাড়ছে

সে। গিয়ার বদলাতে গিয়ে হাতের চাপে হর্ন বাজিয়ে বসল। শেষ আরেকবার অগ্নিদৃষ্টি হানল রানার দিকে। 'আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, মসিয়ো? সত্যি আসছেন না?'

হাত নাড়ল রানা। 'হয়তো অন্য কোনদিন।'

ফ্রেঞ্চ ভাষায় অভিশাপ দিল মেয়েটা, তবে সেটা শুধু চিৎকারই; এতটুকু ঘৃণা বা ক্রোধ ফুটল না। অকস্মাৎ স্পীড বাড়াল সে, রাবারের একজোড়া দাগ রেখে নির্জন খালি রাস্তা ধরে দ্রুত চলে যাচ্ছে মার্সিডিজ কনভার্টিবল।

রানা চিন্তিত, গাড়িটার লাল টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে আছে। দরটা এত কম যে চিন্তা করা যায় না। কাকতালীয় একটা ঘটনা? হতেও পারে। তবে কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাসী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট 'মরহুম' হতে খুব বেশি সময় নেয় না।

রানার যে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় দেখার ইচ্ছে ছিল না, তা নয়। কেউ ওকে টোপ গেলানোর প্ল্যান করছে, তার পরিচয় জানাটা জরুরীও বটে। সোহেল হয়তো একটা ধারণা দিতে পারবে কেন কি ঘটছে। যোগাযোগটা সকালেই হয়, তবে আজ হয়নি। রানা ঠিকই ফোন করেছিল, অপরপ্রান্তে সোহেলকে পাওয়া যায়নি। অ্যানসারিং মেশিন জানিয়েছে, সন্ধ্যা আটটায় আবার অবশ্যই ডায়াল করতে হবে।

এ-সব কথা মাথায় নিয়ে সেইন নদীর দিকে হাঁটছে রানা। রাস্তাটা এখনও আগের মতই নির্জন, শুধু পুরানো, তোবড়ানো একটা সিঁত্রো সিভি-টু ওকে পাশ কাটিয়ে কিছুদূর এগিয়ে থেমেছে, 'ট্যাক্সি গার্ল' চলে যাবার একটু ,পরেই।

ওরা চারজন। প্রত্যেকের গায়ে নীল রেইনকোট। গাড়ি থেকে নেমে কেউ তারা রানার দিকে তাকাচ্ছে না। খুব চিন্তিত মনে হলো লোকগুলোকে, তা না হলে চার মাথা এক করে আলাপ করবে কেন। শক্ত-সমর্থ, একটু খাটো আকারের চার তরুণ; ছাতা বা ছড়ি, সবার হাতেই কিছু একটা আছে। মাথা নিচু করেই ঘুরল

তারা, রানার দিকে হেঁটে আসছে—বোঝা গেল, পায়ে হেঁটে এলিসি প্রাসাদের দিকে ফিরে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এক পাশে একটু সরে এসে ওদেরকে পথ ছেড়ে দিল রানা। মুখগুলো পরিষ্কার দেখা গেল না, কারণ তাদের পিছনে রয়েছে অস্তগামী সূর্য। তাছাড়া, নদীতে প্রতিফলিত রোদ রানার চোখে লাগছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে লোকগুলোকে ভারতীয় বা পাকিস্তানী বলে মনে হলো—কোন দূতাবাসের জুনিয়র অফিসার হতে পারে, কিংবা হয়তো প্যারিসে আসা কোন ট্রেড মিশনের সদস্য। কিন্তু তারপরও ষষ্ঠইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করে দিচ্ছে। ঘাড়ের পিছনে চুল সুড়সুড় করছে। লোকগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল রানা।

নিজেরা ভাগ হয়ে রানাকে পথ করে দিল তারা। তাদের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে রানা, ফরাসি শিষ্টাচার অনুকরণ করে নিচু গলায় 'পার্ডন' বলল, ভাবছে লোক দেখলেই শত্রুপক্ষের এজেন্ট মনে করা একটা মানসিক রোগও হতে পারে। আর ঠিক এই সময় তারা ধরল ওকে।

দু'জন দু'পাশ থেকে একটা করে হাত ধরল, একজন এলো সামনে থেকে, আরেকজন পিছন থেকে। অসম্ভব, দূতাবাসে কলম পেষা এদের পেশা হতেই পারে না; এরা অভিজ্ঞ ও দক্ষ গুণ্ডা। রানা অনুভব করল, ওর হাত দুটোয় যেন আঁটসাঁট লোহার আঙটা পরানো হয়েছে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও ছাড়ানো যাচ্ছে না, হাত দুটো মুচড়ে পিছনে শিরদাঁড়ার কাছে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে, ভাবল রানা। নিজের ওপর রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক। ও মেয়েটাকে চেনে না, তবে মেয়েটা ওকে চেনে। মোচড়ানো হাতে ব্যথা বাড়ছে, সেই সঙ্গে রাগটাও। সামনের লোকটা হাসছেও না, চোখে-মুখে হিংস্র কোন ভাবও নেই। দ্রুত, প্রায় চোখের পলকে কাছে চলে এলো সে; ছড়িটা মাঝখান থেকে ভেঙে হাতে নিল ধারাল ফলার লম্বা একটা

ছুরি, সেটা ফুসফুস চিরে দিয়ে হৃৎপিণ্ড ফালি করার উদ্দেশ্যে নিচ থেকে চালাল ওপর দিকে । দু'পাশের দুই লোকের ওপর শরীরের ভার তুলে দিয়ে পা দুটো বিদ্যুৎবেগে সামনে ছুঁড়ল রানা—ঝুলন্ত অবস্থায় লাথি মারল খুনীটার মুখে। উরুর পিছনে আগুনের ছ্যাঁকা লাগার মত একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি হলো। ওর সামনের শত্রু জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে কামানের গোলার মত ছুটে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে, তবে ফুটপাতে তার ঢলে পড়ার দৃশ্য দেখার সময় নেই রানার। পিছনের লোকটা আগে হামলা করুক, তারপর ও বদলা নেবে, এ-ধরনের বোকামি করতে রাজি নয় ও। অ্যাকশনের শুরুতে দ্বিতীয় ছুরির মালিক নিজেদের কাউকে লাগার ভয়ে যদি হামলা করে না থাকে, সেটা তার মন্দ কপাল। এই খেলায় সুযোগ মাত্র একবারই পাওয়া যায়।

একটু ঘুরল রানা, ফলে ওর একপাশের লোকটা দ্বিতীয় ছুরির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করল ও, লোকটা মাথা ও বুক পিছিয়ে নিচ্ছে দেখে পিছনে শুয়ে পড়ার ভঙ্গি করে পা চালাল দ্বিতীয় লোকটার নাক-মুখ সই করে। গায়ের জোরে মেরেছে লাথিটা, লোকটার দু'সারি দাঁতের সামনের সব ক'টাই মাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো, মট করে শব্দ তুলে চোয়ালের হাড়টাও ভেঙে গেল। নাকটা যেন উপুড় করা তেলের বোতল হয়ে উঠল, কল-কল করে রক্ত বেরুচ্ছে। লোকটা পড়ে যাচ্ছে। রানার একটা হাত মুক্ত।

এদেরকেই সত্যিকার প্রফেশনাল বলতে হয়। প্রত্যেকে নিঃশব্দে লড়ছে। চোখ ও কান থাকলে আশপাশের সুরম্য অট্টালিকাগুলো মৌন গাম্ভীর্যের সঙ্গে চাক্ষুষ করছে প্রতিটি অ্যাকশন, শুনতে পাচ্ছে কর্কশ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ফুটপাথের পাকা মেঝেতে জুতোর ঘষা, আর ধরাশায়ী এক লোকের গোঙানি।

ছুরি হাতে দ্বিতীয় লোকটা অকস্মাৎ ভূতে পাওয়া মানুষের মত

নাচতে শুরু করল—ওপর-নিচে ও চারপাশে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে রানার নাগাল পাবার। এই মুহূর্তে রানার খুব সুবিধে, কারণ ওর হাত মুচড়ে ধরে থাকা লোকটাকে ছুরির বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে যখন যেদিকে প্রয়োজন ঘুরে গিয়ে। ছুরির নৃত্যরত মালিক সঙ্গীর উদ্দেশে কি যেন বলল, কথাগুলো দুর্বোধ্য লাগলেও ভাষাটা ভারত বা পাকিস্তানের কোন অনুন্নত অঞ্চলের হতে পারে বলে ধারণা করল রানা। বাহু আঁকড়ে ধরে থাকা লোকটা অকস্মাৎ একপাশে বাঁকা হয়ে ওর তলপেটে হাঁটু চালাল। হাঁটু আসছে, টের পেয়ে নিজের ভাঁজ করা হাঁটু উঁচু করে দেয়াল তুলে দিল রানা। হাড় ছুটে এসে আরও শক্ত হাড়ে বাড়ি খেলো, ব্যথায় ককিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছু হটল লোকটা, পা ভেঙে গেছে। এরপরই রানার হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তলটা, ওয়ালথার; অনেক হুড়োহুড়ি হয়েছে, এবার কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে ওকে।

ছুরি হাতে লোকটা নাচবেই, পিস্তল দেখিয়েও তাকে থামানো যাচ্ছে না। সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা, এ লোকটা সম্ভবত পাগল—ফ্যানাটিক।

অকস্মাৎ একটা রণহুংকার বেরিয়ে এলো লোকটার গলা থেকে, তারপর লাফ দিল রানাকে লক্ষ্য করে। বোঝাই যাচ্ছিল লাফ দেবে, কাজেই সরে আসতে পারল রানা। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ। পরপর দুটো। চিৎকারও হলো। তারপর শুধু খক-খক কাশির শব্দ।

সেই যার পা ভেঙেছে, নিজের রক্তের ওপর তাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল—সঙ্গীর বুলেট দুটোকে পথ না ছাড়ার পরিণতি। যে লোকটার হাতে পিস্তল সে ক্রল করে সরে যাচ্ছে, রানাও পিস্তলের মাঝখানে কোন বাধা নেই দেখলেই ট্রিগার টেনে দেবে। আবার গুলির আওয়াজ হলো। ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওয়ালথারের মাজল থেকে। পিস্তলধারী প্রবল একটা ঝাঁকি খেলো,

দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর, থরথর করে কাঁপল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল। ঝুঁকে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে, ঘুরল রানা; ছুরি হাতে দ্বিতীয় লোকটাকে সামলাবে। তবে তার আর প্রয়োজন হলো না। পা জোড়া যত দ্রুত সম্ভব নদীর দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। কারও পিঠে গুলি করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। রক্তের ধারা ক্রমশ লম্বা ও চওড়া হচ্ছে, তার মধ্যে পড়ে রয়েছে দুটো লাশ। অপর লোকটা মড়ার মতই স্থির ও রক্তাক্ত। ঝুঁকে তার সোলার প্লেক্সাসে খোঁচা মারল রানা। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। চোখের একটা পাতা তুলে দেখল, মণি একদম স্থির। এই লোকের জ্ঞান ফিরতে দেরি আছে। দুঃসংবাদই, কারণ কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাচ্ছে না রানা। এখানে লাশ নিয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাও বোকামি। পুলিসকে সব ব্যাখ্যা করে বিশ্বাস করানো খুব কঠিন আর ঝামেলার কাজ।

ঘুরল রানা। অকুস্থল পিছনে ফেলে রেখে হোটেলের দিকে ফিরে যাচ্ছে। মনে প্রশ্ন: কারা ওর সঙ্গে খেলতে চাইছে? খেলাটার নামই বা কি?

দুই

'ওরাইযা স্যাটিভা,' বললেন রাহাত খান।

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'সার?'

'ওরাইযা স্যাটিভা এক ধরনের ঘাসের বৈজ্ঞানিক নাম। এর

বীজকে বলে ধান, ধান থেকে হয় চাল, আর সেই চাল ফুটিয়ে ভাত – দুনিয়ার মানুষের প্রধান খাদ্য।'

রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার সেফ হাউস এটা, নির্জন ও খালি ঘরে একা বসে রয়েছে রানা; কামরার ভেতর আসবাব-পত্র বলতে শুধু কাঠের একটা চেয়ার আর টেবিলের ওপর একটা চল্লিশ ইঞ্চি কালার টিভি। রানা রয়েছে প্যারিসে, রাহাত খান ঢাকায়, সোহেল তিউনিশিয়ার কোন শহরে; তিনজনের মধ্যে এই মুহূর্তে একটা টিভি-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রানার টিভি স্ক্রীনে ঢাকার দৃশ্য অর্থাৎ রাহাত খান যেমন আছেন, তেমনি তিউনিশিয়ার একটা কামরায় বসা সোহেলও অর্ধেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। একইভাবে, রাহাত খানের টিভি স্ক্রীনে রানা ও সোহেল আছে, সোহেলের টিভি স্ক্রীনে আছেন রাহাত খান ও রানা। এই টিভি-কনফারেন্স আয়োজন করার ব্যাপারে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার টেকনিশিয়ানরা মূল ভূমিকা পালন করেছে।

কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে টিভি স্ক্রীনের অর্ধেক দখল করে থাকা ইমেজটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা–কাঁচা-পাকা চুল ও ভুরু, কপালের নিচে পুরু লেন্সের চশমা, দু'সারি দাঁতের ফাঁকে ঢাউস আকারের হাভানা চুরুট, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি; এই সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের প্রতিই ওর সমস্ত আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ।

ক্ষীণ একটু উদ্বেগ জাগল, বস্ কি কোন কারণে বিচলিত? 'সার, ব্যাপারটা যদি বড় কিছু হয়ে থাকে, তাহলে এখুনি আপনাকে জানানো দরকার যে অন্তত প্যারিসে আমার কাভার বলে কিছু নেই–ওটা এখন স্রেফ ফাটা একটা বেলুন।'

'ঠিক আছে,' বললেন রাহাত খান, নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে গিয়েও ধরালেন না। 'কি ঘটেছে অল্প কথায় বলো। আমাদেরকে আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করতে হবে।'

সংক্ষেপেই বলল রানা কি ঘটেছে।

'হুম্‌ম্‌।' রাহাত খান গম্ভীর। 'সোহেল?'

টিভি স্ক্রীনের এক প্রান্ত থেকে সোহেল বলল, 'এ নিশ্চয়ই ওয়াসিম মালিকের কাজ, সার।'

'এভাবে লাশ পড়া আমি পছন্দ করতে পারছি না,' বললেন রাহাত খান। তবে কিছু করারও নেই। মারতে আসলে মরতে তো হবেই, 'তবু যদি ওদের শিক্ষা হত। শোনো, রানা, কাভার নষ্ট হয়েছে হোক। এই অ্যাসাইনমেন্টে কাভারের আর তেমন কোন গুরুত্ব নেই।'

আরেকটু হলে চেয়ার থেকে রানা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। এটা নিশ্চয়ই খুব বড় কোনও অ্যাসাইনমেন্ট। ও এতদিন জেনে এসেছে, বস্‌ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এজেন্টদের কাভারের ওপর। তাঁর দৃষ্টিতে, এসপিওনাজে নিখুঁত কাভারই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে অনেক এজেন্টকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে, শুধু এই কারণে যে বসের মনে হয়েছে প্রতিপক্ষ একটু-আধটু সন্দেহ করছে। 'ওয়াসিম মালিক?' সোহেলকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কে সে?'

জবাব দিলেন রাহাত খান, বললেন, 'তার কথা একটু পরে শুনো। গত হপ্তায় বাংলাদেশ বিমানের নিখোঁজ বোয়িংটা সম্পর্কে লেটেস্ট খবর জানো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল, তারপর সবগুলো রাডার আর রেডিও থেকে হারিয়ে যায়।'

'হারায়নি,' রাহাত খান বললেন, আরও একবার ধরাতে গিয়েও ধরালেন না চুরুট। 'প্লেনটা হাইজ্যাক করা হয়েছিল। তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে, ফাঁকা মরুভূমিতে বিধ্বস্ত প্লেনটাকে দেখতে পায় ওই দেশেরই ডোমেস্টিক ফ্লাইটের একজন পাইলট। আমাদের এক্সপার্টরা গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে এসেছে। দুর্ঘটনাটা সাজানো। ওদিকের মরুতে সমতল পাথর আছে মাইলের পর মাইল, ফলে প্লেন ল্যান্ড

করাতে হাইজ্যাকারদের কোন অসুবিধে হয়নি। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়।'

'ওহ্, গড!'

'বাংলাদেশ বিমানের ওই ফ্লাইটে...,' কথার মাঝখানে হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে রাহাত খান তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর নাম শুনেছ? একজন বিজ্ঞানী–মাইক্রোবায়োলজিস্ট?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জ্বী-না, মনে পড়ছে না।'

'ভদ্রলোক বাঙালী, তবে পাকিস্তানেই বসবাস এবং গবেষণা করছিলেন...'

'কেন?'

'এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় তুমি সোহেলের কাছ থেকে জেনে নিয়ো,' বললেন রাহাত খান, এতক্ষণে চুরুটটা ধরালেন। 'তবে প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর সম্পর্কে না জানাটা তোমার জন্যে একটা ডিসক্রেডিট। বলা হয়, ম্যাথাম্যাটিক্সে আইনস্টাইন যা ছিলেন, বর্তমানে মাইক্রোবায়োলজিতে ফারুক চৌধুরী ঠিক তাই। পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তিনি। শুধু তাই নয়, দার্শনিক ও কবি হিসেবেও খ্যাতি আছে। বাংলাদেশ বিমানের ওই ফ্লাইটে তিনি ছিলেন, রানা। শুধু ছিলেন না, পালিয়ে গোপনে বাংলাদেশে চলে আসছিলেন। ওই ফ্লাইট ধরার জন্যে যে পাসপোর্টটা তিনি ব্যবহার করেছেন সেটা আমরাই নকল করে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিই। কাজটা সুষ্ঠুভাবে সারার জন্যে ঢাকা, লন্ডন আর ব্রাসেলসে রাতদিন কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদের।'

মনে মনে একটু গর্ববোধ করল রানা, কারণ খুব ভাল করে জানে যে আইএসআই এজেন্টদের বোকা বানিয়ে তাদের একজন বিজ্ঞানীকে বাংলাদেশ বিমানে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।

'প্রফেসর ফারুককে কোন্ রুট ধরে নিয়ে আসব, শুরুর দিকে এটা ঠিক করতে পারিনি বলেই তোমাকে প্যারিসে আর জাহিদকে

ম্যানিলায় পাঠাই আমি,' আবার শুরু করলেন রাহাত খান। 'সে যাই হোক, এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। বিজ্ঞানী হিসেবে প্রফেসর ফারুকের গুরুত্ব এত বেশি যে তিনি যা বলবেন পাকিস্তান সরকার তা শুনতে বা মানতে বাধ্য। তবে তিনি যে পাকিস্তান ত্যাগ করে বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশে চলে যেতে চান না, এটা তারা প্রায় ধরেই নিয়েছিল। পাকিস্তান থেকে বহুবার তিনি বিভিন্ন দেশে ট্যুরে গেছেন, কখনোই পালাবার কোন চেষ্টা করেননি। কিন্তু এত বছর পর এবারই একটা সঙ্কট দেখা দিল।

'প্রফেসর ফারুক চৌধুরী দাবি করেন, তিনি এমন একটা বীজধান আবিষ্কার করেছেন, যে-কোন ধানখেতে এক মুঠো ছড়িয়ে দিলে তা থেকে যে গাছ জন্মাবে, সেগুলো শুধু ওই খেতই নয়, সংলগ্ন সবগুলো খেতের ফসল না পাকা পর্যন্ত সব ধরনের ছত্রাক রোগ ও ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে মুক্ত রাখবে। নিজের এই আবিষ্কারকে বায়োলজিক্যাল মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন তিনি। এখন ভেবে দেখো, সারা দুনিয়া জুড়ে প্রতি বছর কত ধানখেত ছত্রাক রোগে ও পোকামাকড়ের হামলায় নষ্ট হয়। অর্থাৎ তাঁর এই আবিষ্কার মানবকল্যাণে অমূল্য অবদান রাখতে যাচ্ছে। তবে মুদ্রার আরও একটা পিঠ আছে, রানা।

'প্রসঙ্গক্রমে ফারুক চৌধুরী পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে এ-কথাও জানান, গবেষণার এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন আরও একটা বীজধান আবিষ্কার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব যার কাজ হবে প্রথমটার ঠিক উল্টো, অর্থাৎ এটা যে-কোন ধানখেতে এক মুঠো ছড়িয়ে দিলে তা থেকে যে চারা জন্মাবে সেগুলো ওই খেত-সংলগ্ন সবগুলো খেতের সমস্ত ফসল মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নষ্ট করে দেবে। প্রফেসর তাঁর এই দ্বিতীয় আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন মৃত্যুবীজ।'

'আল্লাহ্! আশ্চর্য!' ঠিক বোঝা গেল না খবর শুনে রানা উল্লসিত, নাকি আতংকিত।

'পাকিস্তান সরকার, বিশেষ করে আইএসআই, হাতে যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল,' বলে যাচ্ছেন বিসিআই চীফ। 'তারা প্রফেসরকে অনুরোধ করল, তিনি যেন প্রথমে দ্বিতীয় বীজধানটাই তৈরি করেন। প্রফেসর বুঝলেন, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ভাল নয়, তারা মৃত্যুবীজ হাতে পেতে চাইছে সবগুলো শত্রু-দেশের সমস্ত ধানখেত ধ্বংস করার জন্যে। আর এ তো জানা কথাই, কোনও দেশের সমস্ত ধানখেত নষ্ট হয়ে গেলে সে দেশের লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যাবে।'

আরও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করল রানা, তবে নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ায় আলাদাভাবে শোনা গেল না।

'পাকিস্তান সরকার বা আইএসআই তাঁর আবিষ্কার নিয়ে কি করবে বুঝতে পারার পর প্রফেসর চৌধুরীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো, সেই থেকে আর কাউকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।' রাহাত খান ঘন ঘন টান দিলেন চুরুটে। 'সেজন্যে অবশ্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। যাই হোক, কাউকে বিশ্বাস করতে না পারার কারণে আমাদের সাহায্য ছাড়াই পাকিস্তান থেকে একবার পালাবার চেষ্টা করেন তিনি। এর মানে হলো, আমরা ধরে নিচ্ছি, বাংলাদেশের কাছেও কোনভাবে ঋণী হতে চাননি তিনি। বুঝতেই পারছ, তাঁর সেই পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

'তাঁর সম্পর্কে আমরা যা কিছু জেনেছি, সবই তাঁর এক কলিগ-এর কাছ থেকে–ভদ্রলোক ফিলিপাইনের নাগরিক, ওয়ার্ল্ড রাইস ইন্সটিটিউট-এর একজন গবেষক। বহু বছর ধরে তৈরি করা জটিল কোড বা সাংকেতিক ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন তাঁরা, যে কোড-এর ভিত্তি হলো মাইক্রোবায়োলজির ফর্মুলা থেকে শুরু করে বিশ্বসেরা দাবাড়ুদের শ্রেষ্ঠ খেলাগুলো। ওই ফিলিপিনো ভদ্রলোকও প্রফেসর চৌধুরীর প্রায় সম পর্যায়ের প্রতিভা।

'তাঁদের এই কোড ভাঙা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। পাকিস্তানী

ক্রিপটোগ্রাফি এক্সপার্টরা শুধু ঘামেনি, শুনেছি কেউ কেউ নাকি কেঁদেও ফেলেছে। ফিলিপিনো ওই প্রফেসরের মাধ্যমে ফারুক চৌধুরীকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম আমরা, তিনি যাতে বাংলাদেশে চলে আসতে পারেন। এই সময়, গত হপ্তায়, পাকিস্তান সরকার বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁকে ব্রাসেলসে পাঠাল। সম্মেলনের শেষ দিকে শুধু আইএসআই সার্ভেইল্যান্স নয়, বিসিআই সার্ভেইল্যান্সকেও ফাঁকি দিয়ে লন্ডনে চলে যান তিনি, তৃষাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'তৃষা?'

'তাঁর মেয়ে। সে-ই বাপের সেক্রেটারি। আমরা প্রায় নিশ্চিত, লন্ডন থেকে প্যারিসে চলে গেছে সে। আমাদের বোয়িং-এ সে ওঠেনি। সেদিনই এয়ার ফ্রান্সের একটা প্লেনে উঠে এক মেয়ে প্যারিসে যায়—পরিচয় ও পাসপোর্ট না মিললেও, এই মেয়েটিই তৃষা চৌধুরী বলে আমাদের ধারণা। প্যারিসের পুলিসকে তাগাদা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু মেয়েটার কোন খোঁজই তারা দিতে পারছে না।'

'বিজ্ঞানী ফারুক চৌধুরীর কি হলো?' জানতে চাইল রানা। 'সাজানো দুর্ঘটনায় ফেলে আইএসআই তাঁকে খুন করেছে?' এখনও বুঝতে পারছে না এ-সব ঘটনার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক।

'না। বোয়িং-এ দেড়শো আরোহী ছিল, ক্রুসহ। একজন বাদে বাকি সবার পোড়া কংকাল পাওয়া গেছে। ওই একজন হলেন ফারুক চৌধুরী। আমাদের কাছে খবর এসেছে, দুর্গম পাহাড়, গিরিখাদ ও মরুভূমির মাঝখানে যে ল্যাবরেটরিতে তিনি গবেষণা করবেন, সেখানে তাঁকে দেখা গেছে। কোয়েটার জিয়ারত থেকে প্রায় একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে জায়গাটা। পাকিস্তান সরকার গোটা এলাকাটাকেই নিষিদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। তার অবশ্য কারণও আছে। ওদের বায়োলজি ল্যাবগুলো সব ওদিকেই। কিছু বেদুইন আর সারাং জাই ছাড়া মানুষজন নেই, কাজেই দুর্ঘটনা ঘটলে মারাত্মক কোন ক্ষতির আশঙ্কাও কম।

তাছাড়া, নির্জন এলাকায় নিরাপত্তা বজায় রাখা খুব সহজও।

'প্রফেসর চৌধুরীকে ল্যাবরেটরিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুস্থ-সবল অবস্থায় মেয়েকে ফিরে না পেলে কাজ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর ধারণা, তিনি বাংলাদেশে চলে আসতে চেষ্টা করায় আইএসআই প্রতিশোধ হিসেবে তৃষাকে কোথাও আটকে রেখেছে।' ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল রাহাত খানের ঠোঁটে। 'আমি চাই এই ধারণায় তিনি যেন স্থির থাকেন।'

'আইএসআই জানে মেয়েটা প্যারিসে কোথাও লুকিয়ে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, জানে না,' উত্তরটা সোহেলের কাছ থেকে এলো। 'ওদের এজেন্টরা পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো দেশ চষে বেড়াচ্ছে। মুশকিল হলো, আমরাও জানি না প্যারিসের কোথায় আছে তৃষা।'

'আমার কাজ কি তাহলে ওই মেয়েটাকে খুঁজে বের করা?' সোহেলকেই জিজ্ঞেস করল রানা। 'তৃষাকে না পেলে পাকিস্তান মৃত্যুবীজও পাচ্ছে না।'

'এটা মূল অ্যাসাইনমেন্টের একটা অংশমাত্র,' সোহেল নয়, রাহাত খান জানালেন। 'বলা যায় প্রথম অংশ–হ্যাঁ, পাকিস্তানীদের আগে তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে প্রফেসর চৌধুরীর মেয়েকে। সাবধান, আইএসআই আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। ইউরোপে ওদের অপারেশন-এর প্রধান হলো ওয়াসিম মালিক।' একটা ফাইল খুলে এক কপি ফটো বের করলেন তিনি, স্ক্রীনের দিকে তুলে ধরলেন সেটা। ফটোর সুদর্শন লোকটাকে একটু চেনা চেনা লাগল রানার, তবে মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে। 'এটা ওয়াসিম মালিকের ফটো। কাল সকালের পাউচে ফটোসহ তার ডোশিয়ে পেয়ে যাবে তুমি। পড়লে বুঝতে পারবে কেমন টাফ কাস্টমার। সরকারের টাকা দরিয়ায় ঢালতে অভ্যস্ত, নারীসঙ্গ ছাড়া বাঁচে না। এই মুহূর্তে তৃষার খোঁজে আমাদের মতই অস্থির

হয়ে আছে সে।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আই উইশ ইউ গুড লাক, রানা। এরপর সোহেল জানাবে তোমাকে বাকিটুকু।'

'আরেকটা কথা, রানা,' রাহাত খান টিভি স্ক্রীন থেকে গায়েব হয়ে যেতেই শুরু করল সোহেল, 'খলিল শোকরানকে ছোট করে দেখবি না।'

'সে আবার কে?'

'ওয়াসিম মালিকের বডিগার্ড,' বলল সোহেল। 'আচরণ দেখে মনে হতে পারে পাগলামির ভান করছে, কিন্তু তা সত্যি নয়। লোকটা আসলেও পাগল–মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার, স্যাডিস্ট, মানুষকে যত ভাবে পারা যায় নির্যাতন করে আনন্দ পায়।'

রানার গলায় অবিশ্বাস, 'একটা পাগলকে কেউ বডিগার্ড হিসেবে নেয়?'

'খলিল শোকরানের পাগলামিটাই মস্ত এক গুণ,' বলল সোহেল। 'সে তার বসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে নয়, তারচেয়ে বেশি মাত্রায় পালন করে। কি বলছি বুঝতে পারছিস? ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে না, খুন করে লাশ বয়ে আনে।'

রানা কিছু বলছে না।

'আরও একটা কারণে শোকরানকে নিজের কাছে রেখেছে মালিক,' একটু থেমে বলল সোহেল। 'শোকরানই তার জন্যে মেয়ে যোগাড় করে আনে। এই কাজে রীতিমত দক্ষ সে।'

'হুম।'

'তোর যদি সহকারী দরকার হয়, রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার প্রধান রফিককে তৈরি রাখা হয়েছে। নতুন একজন অ্যামব্যাসাডরকে ইনফর্মাল রিশেপসন দেয়া হচ্ছে, ওই পার্টিতে তোর জন্যে অপেক্ষা করবে রফিক। আমরা চাই তুই ওখানে যাবি, কারণ মালিক সম্ভবত ওখানে থাকবে। তোর ধারণা যদি ঠিক হয়, সে যদি তোকে চিনে ফেলে থাকে, কাছ থেকে তাকে তোর একবার দেখে রাখা দরকার।'

'প্রফেসর ফারুক চৌধুরী সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও আমি পাইনি,' সোহেলকে মনে করিয়ে দিল রানা। 'উনি বাঙালী। তাহলে পাকিস্তানে গবেষণা করছেন কেন?'

'খুব বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, আবিষ্কারক বা যে-কোন বিরল প্রতিভার আলাদা বা নির্দিষ্ট কোন দেশ থাকে না,' বলল সোহেল। 'তাঁরা মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, গোটা দুনিয়াই তাঁদের দেশ। জানি, আমার এই উত্তর অন্তত এক্ষেত্রে তোকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।'

'না, পারছে না,' বলল রানা। 'কারণ পাকিস্তানীরা আমাদেরকে বোকা ও নিকৃষ্ট মনে করে শোষণ করেছে, অথচ মুখে বলেছে আমরা মুসলমানরা পরস্পরের ভাই। তারপর আমরা যখন শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালাম–সব হিন্দু হয়ে গেছি, এ-কথা বলে নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা, গোটা দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল। এই ঘটনার পর যদি শুনতে হয় একজন বাঙালী পাকিস্তানে বসে তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে, স্বভাবতই সন্দেহ হয় লোকটা নির্ঘাত রাজাকার হবে।'

'তোর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত,' বলল সোহেল। 'তবে প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর ব্যাপারটা আলাদা। সংক্ষেপে, তাঁকে রাজাকার বলার কোন উপায় নেই।'

'সংক্ষেপে নয়, খুলেই বল্,' দাবি জানাল রানা।

'ফারুক চৌধুরী ভালবেসে বিয়ে করেছেন পাকিস্তানের হিংস্র এক উপজাতি সারাং জাই গোষ্ঠির এক সর্দারের মেয়েকে,' বলল সোহেল। 'এই সারাং জাইদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্ক কোন কালেই ভাল ছিল না। একাত্তর সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে ফারুক চৌধুরী পাকিস্তানে আটকা পড়েন। স্বাধীনতার পর তাঁর স্ত্রী বাংলাদেশে আসার জন্যে জেদ ধরেন, যুক্তি দেখান একটা মেয়ের উচিত স্বামীর দেশকেই নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করা। তাছাড়া, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায়ই তাদের

সম্প্রদায়ের ওপর বিনা কারণে হামলা চালাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর বাবা, সারাং জাই দের সর্দার মুরাদ খাজাই, একমাত্র মেয়েকে চিরকালের জন্যে অন্য একটা দেশে যেতে দিতে একদমই রাজি হলেন না। তিনি শুধু একা নন, আপনজনেরা কেউই তাকে ছাড়ল না। ফারুক চৌধুরী নানা ভাবে এই সারাং জাই দের প্রতি ঋণী ও কৃতজ্ঞ, কাজেই শ্বশুর পক্ষের আবদারকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানে থেকেই গবেষণা চালাবেন। তবে এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো,' বলে দম নেয়ার জন্যে একটু থামল সোহেল।

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'ফারুক চৌধুরী তো বাংলাদেশে আসতে চাইছেনই,' বলল সোহেল, 'সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও আসবেন। ভদ্রমহিলার বাবা, সারাং জাই সর্দার এখন বলছেন যে মেয়ে-জামাইকে অবশ্যই পাকিস্তান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। শুধু তাই না, মেয়েকে তিনি এরইমধ্যে নিজের কাছে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছেন।'

'ও.কে.–এই ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট,' বলল রানা। 'আর কিছু?'

'যখন দেখা হবে, মনে রাখবি ওয়াসিম মালিক সবার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কারণ পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে। মানে, তোর আচরণে সাবধানতা থাকা দরকার।'

'ঠিক আছে, দেখা হলে তাকে আমি শালা বলে গাল দেব, কিন্তু শুনে মনে হবে সালাম দিলাম। জ্ঞান বিতরণ বন্ধ করে কাজের কোন কথা থাকলে বল, তা না হলে স্ক্রীন থেকে ভাগ।'

'দিন কয়েক শহরের বাইরে ছিল সে,' রানার কৌতুক বা বিরক্তি সোহেলকে যেন স্পর্শই করেনি। 'সময়ের মিলটা সন্দেহজনক। আমার বিশ্বাস, সে-ই প্লেনটা হাইজ্যাক করে। প্রফেসর চৌধুরীকে জোর করে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দেড়শো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে খুন করতেও তার বাধেনি।'

রানার চোখে কঠিন একটা ভাব ফুটল। 'এই লোকের বাঁচার কোন অধিকার নেই।'

'না, নেই,' সায় দিল সোহেল।

রানা প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'মেয়েটার কোন ফাইল আছে আমাদের কাছে?'

'আমরা তার সম্পর্কে যতটুকু জানি, রফিক তোকে সব জানাবে,' বলল সোহেল। 'পাকিস্তানীদের বড় একটা সুবিধে হলো, তারা জানে মেয়েটা কি রকম দেখতে। কিন্তু আমরা জানি না।'

'খারাপ কথা।'

'মাত্র কিছুক্ষণ আগে একটা খবর এসেছে,' বলল সোহেল, একটু উত্তেজিত। 'এক ফ্রেঞ্চ তরুণী, সাংবাদিক, প্যারিসের একটা পত্রিকায় ছাপার জন্যে প্রফেসর চৌধুরীর মেয়ে তৃষার একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল ব্রাসেলসে। সাংবাদিক মেয়েটার নাম লুসিন্ডা লাজুলি। সাক্ষাৎকারটা নেয়া হয়েছে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে–মহান একজন বিজ্ঞানীকে মেয়ের চোখ দিয়ে দেখা, পাকিস্তানে মেয়েটার সুবিধে-অসুবিধে, লেখাপড়া ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে লুসিন্ডাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে তৃষা, তা না হলে প্যারিসে পালিয়ে আসার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করত না।'

'কিভাবে যোগাযোগ করেছে?'

'লুসিন্ডাকে টেলিফোন করে তৃষা,' বলল সোহেল। 'দু'জন আলোচনা করে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

'তারপর?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'তারপর কিছু না। তৃষা আসেনি। এখন এর বেশি কিছু জানাবার নেই তোকে। গুড লাক, দোস্ত।'

তিন

প্যারিস যেন নষ্টা এক রসিকা বাইজী, বুড়ি হয়ে গেলেও কিভাবে যেন তার রূপ-যৌবন আর বেশিরভাগ ধন-সম্পদ ধরে রেখেছে। সৌন্দর্য, বিশুদ্ধতা আর সততার যারা ধারক তাদের প্রতি তার মমতা আছে, কিন্তু তাদেরকে খুব একটা বিশ্বাস করে না। এই শহর সিক্রেট এজেন্টদের জন্যে আদর্শ, ভাবল রানা। দামী এক গ্লাস শ্যাম্পেনের সদ্ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে ও, কারণ পার্টির আয়োজকদের তরফ থেকে এক মক্ষীরানী খানিক পরপরই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এটা সত্যিকার অর্থে একটা ওয়াইল্ড পার্টি, কেউ যদি মদ খেয়ে বেসামাল না হয় তাহলে উপস্থিত বাকি সবাইকে অপমান করা হবে।

বাইরে থেকে দেখলে প্যারিসকে মনে হবে শুভ ও সুন্দরের আলোকবর্তিকা নিয়ে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসবে মুখর এক নগরী, স্বাপ্নিক আর শিল্পীদের প্রতি সহানুভূতিশীল এক স্বর্গ। কিন্তু প্রশস্ত বুলেভার্ড আর চোখ জুড়ানো ফুলবাগানের পিছনের দালানগুলোয় দুনিয়াদারির নানারকম দৈনন্দিন কাজকর্ম চলে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি নামে চতুর এক ফ্লরেনটাইন বুড়োর তৈরি নীতিমালার অনুসরণে। রানা চিন্তা করছে, বেকার ও কপর্দকহীন অবস্থায় ম্যাকিয়াভেলির মৃত্যু হয়েছিল—এই ঘটনাতেও শিক্ষণীয় কিছু আছে কিনা।

চিন্তাটা ডালপালা গজাবার সুযোগ পেল না, কারণ রাতের

বয়স এখনও কাঁচা, আর পার্টিতে সুন্দরী মেয়েরা এসেছে একটা-দুটো নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে। ওর সবচেয়ে কাছের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খুলে যেতে প্রায় একশো ফুট নিচে রাস্তার বহুরঙা, ঝকমকে, চঞ্চল আলোকসজ্জা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার উপক্রম করল, স্কাইলাইনটাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে বিজয়তোরণ বা আর্চ অভ ট্রায়াম্ফ।

রফিক রায়হান, রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা-প্রধান, পাশ থেকে নিচু গলায় বলল, 'মাসুদ ভাই!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো এক লোককে দেখল রানা।

'খলিল শোকরান, মাসুদ ভাই,' আবার ফিসফিস করল রফিক। 'ওয়াসিম মালিকের ডান হাত। যেখানেই যাক মালিক, পরিস্থিতি বোঝার জন্যে আগে শোকরানকে পাঠায়।'

'দেখে তো শোকরানকে মারাত্মক কিছু মনে হচ্ছে না।' একটু হাসল রানা। 'শরীরে স্নেহপদার্থের পরিমাণ বেশি, কিন্তু সেটা তো ওর নিজের জন্যেই ক্ষতিকর।'

'ওর এই নাদুসনুদুস চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই,' বলল রফিক। 'শুনেছি, দেশে যখন থাকে, রোজ রাতে অন্ধকার গলি থেকে একটা করে বিড়াল ধরে আনে–নির্যাতন করে সেটাকে মারতে ভোর হয়ে যায়।'

চর্বির ডিপো হলেও শোকরান মোটেও লম্বা-চওড়া নয়, পরিবেশে বিপদের কোন গন্ধ না পেয়ে চোখে-মুখে বোকা বোকা হাসি নিয়ে হলরূম ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে। মাত্র দশ সেকেন্ড পরই ওই একই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল একদল সুবেশী তরুণ, তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যার মাথা উঁচু হয়ে রয়েছে সে-ই হলো আইএসআই-এর ইউরোপীয় কর্মকর্তা। অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ, বলিষ্ঠ শরীর, চওড়া কাঁধ, প্যারিসের বিখ্যাত ফ্যাশন হাউস থেকে অর্ডার দিয়ে বানানো সুট পরে আছে, হাত দুটো তুলে দিয়েছে দুই

স্বর্ণকেশী, শ্বেতাঙ্গিনী তরুণীর নগ্ন কাঁধে।

'আমাদের প্রতিপক্ষ, মাসুদ ভাই–জনাব ওয়াসিম মালিক,' বলল রফিক। 'দলে নতুন কোন মুখ দেখছি না। এরা সবাই ভক্ত, প্রয়োজনে তার জন্যে জান পর্যন্ত দিতে পারে। কোত্থেকে পায় কে জানে, লোকটা দু'হাতে টাকা ওড়ায়।'

ওয়াসিম মালিকের বন্ধু আর ভক্তের সংখ্যা অনেক, একটা দল তো তাকে ঘিরে রেখেছেই, প্রতি মুহূর্তে নতুন লোকজন এসে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। উত্তরে মালিকের তাকানো, হাসি, কথা, মাথা ঝাঁকানো ইত্যাদি সবই অত্যন্ত মার্জিত ও পরিশীলিত।

'আজ কিন্তু লোকটাকে একটু মনমরাই লাগছে, মাসুদ ভাই,' নিচু গলায় বলল রফিক। 'শুনেছি আজ সন্ধের দিকে তার ক'টা পোষা কুকুরকে কে যেন মেরে ফেলেছে।'

'তোমাকে তো এখনও কিছু জানানো হয়নি, এ খবর তুমি পেলে কিভাবে?' স্বাভাবিক সুরেই প্রশ্ন করল রানা।

রানার দিকে ফিরে আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে একটু মাথা নোয়াল রফিক। 'কিভাবে খবর সংগ্রহ করতে হয়, এ তো আমরা আপনার কাছ থেকেই শিখেছি, মাসুদ ভাই।'

রানার মনোযোগ হঠাৎ করেই কেড়ে নিল স্বর্ণকেশী এক মেয়ে, ভিড় ঠেলে ওয়াসিম মালিকের দিকে হেঁটে আসছে। কালো এক সেট পার্টি ড্রেস পরেছে, টাকার অঙ্কে দামটা সম্ভবত এক লাখের কম হবে না। অনাবৃত, সুগঠিত ও তামাটে কাঁধে মখমলের মত স্তূপ হয়ে আছে মাথার চুল। এ-হলো সেই মেয়েটা, রানা নিঃসন্দেহ, যাকে দেখে সম্ভাব্য বিশ্ব-সুন্দরীরাও ঈর্ষা বোধ করবে–মার্সিডিজ কনভার্টিবল নিয়ে টোপ সেজেছিল, গেলাতে না পেরে হর্ন বাজিয়ে ওয়াসিম মালিকের পোষা গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেয় ওকে।

এগিয়ে এসে মালিকের কাঁধে চিবুক ঠেকাল মেয়েটা, কিন্তু মালিক হাত দিয়ে তার কোমর জড়াতে গেলে পিছলে সরে এলো।

'বলি, লেডিকিলার ডিপ্লোম্যাট সাহেব, এই ক'দিন তুমি ছিলে কোথায়? জানো না, তুমি কোনও কাজে কোথাও গেলে সব কেমন জোলো আর পানসে হয়ে যায়?'

একদম বাজে কথা, ভাবল রানা; বরং উল্টোটাই সত্যি–এই মেয়ে অনুপস্থিত থাকলে রাতের প্যারিস একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, শুধু চোখের দেখা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেকেরই ঘুম হবে না সারারাত।

'কিসের কাজ, সুন্দরী, গিয়েছিলাম ফুর্তি করতে,' হেসে উঠে বলল ওয়াসিম মালিক। 'দিনের বেলা ইয়টিং আর রাতের বেলা গ্যাম্বলিং–সময়টা ভাল কাটলেও এক বস্তা টাকা হেরেছি। আমি তো আর তোমাদের ক্যাপিটালিস্টদের মত অঢেল টাকার মালিক নই।'

হাসির দমকে মেয়েটার মাথা পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো। 'মসিয়ো মালিক। সবাই জানে, নিজের দেশে সাবেক এক রাজার ছেলে তুমি। সবাই আরও জানে যে ওই বিলাসবহুল যে শ্যাতোটা তোমার বাবা কিনে রেখে গেছেন সেটার প্রতিটি ক্লজিট সোনা, ডলার আর পাউন্ডে ঠাসা।'

'কোন জার্নালিস্টকে যদি বলি তার দেয়া তথ্য ভুল, তাহলে তাকে অসম্মান করা হয়,' বলে নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে উঠল ওয়াসিম মালিক–শব্দটা বেসুরো বা দীর্ঘস্থায়ী নয়।

'রফিক,' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'মালিকের সঙ্গে ওই মেয়েটা কে?'

'ব্ল্যাক ড্রেস পরাটা? মা-বাবার অবাধ্য, বখে যাওয়া এক মেয়ে। মাঝে-মধ্যে ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টের কাজ করে। বছর খানেক আগে ওর বাবা প্যারিসের সবগুলো কাগজে একটা বিজ্ঞাপন ছেপেছিল–কেউ যদি তাঁর মেয়েকে শান্ত ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে, তাকে তিনি প্যারিসে একটা বাড়ি, দামী একটা গাড়ি এবং নগদ এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার

দেবেন।'

হেসে উঠল রানা। 'কি করে প্রমাণ হবে যে মেয়েটি শান্ত ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে? বাপের কাছ থেকে টাকা খসাবার অভিনয় করতে পারে না, কোনও বয়ফ্রেন্ডের সহায়তা নিয়ে?'

'লুসিন্ডা লাজুলির মা-বাবার এটাই তো সবচেয়ে বড় দুঃখ,' বলল রফিক। 'ওর কোন বয়ফ্রেন্ড নেই। কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয় না সে, এক হপ্তার বেশি সম্পর্কও রাখে না। অবশ্য ওয়াসিম মালিকের সঙ্গে বেশ কিছু দিন হলো যোগাযোগ রাখছে, ব্যাপারটা ব্যতিক্রমই বলতে হবে।'

প্যারিসের অনেকেই চেনে, কালো এক মডেলকন্যা, হাতছানি দিয়ে ডাকতে সেদিকে চলে গেল রফিক। ইতিমধ্যে ভক্ত ও বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে ডান্স ফ্লোরে সরে গেছে ওয়াসিম মালিক, ওদিকে অল্প-বয়েসী তরুণ-তরুণীরা মিউজিকের সঙ্গে তাল রেখে চরকির মত ঘুরে ঘুরে নাচছে।

আজ রাতের এই পার্টিতে আসায় লাভই হয়েছে, ভাবল রানা। প্যারিসে ওর প্রিন্সিপাল কনট্যাক্ট ওই লুসিন্ডা লাজুলি; সে পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই-এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, এটা জানা হলো—ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ফাঁদ এড়াতে তথ্যটা কাজে লাগবে। মেয়েটা সম্পর্কে আরও জানতে হবে ওকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ইতিমধ্যে পার্টি সরগরম হয়ে উঠেছে, চারপাশে কথা বলছে নিমন্ত্রিত অতিথিরা—দু'একটা বাক্য কানে এলেও নিয়মিত যারা ক্লাবের চাঁদা পরিশোধ করে না বা একটা কোডবুক অর্জন করেনি তাদের পক্ষে সে-সব বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা বেশ কঠিন। আর সহজবোধ্য আলাপগুলো নেহাতই একঘেয়ে আর...কি বলা যায়!

দু'জনকে দেখেই বিবাহিতা মনে হলো রানার, একজন আরেকজনকে বলছে, 'কল্পনা করো, ফ্রান্সিসকা, আমাদের চেয়ে

কম বয়েসী একটা মেয়ে প্রকাণ্ড এক মোটর সাইকেলের সঙ্গে প্রেম করছে–ব্যস, এটুকুই, আর কিছু ঘটল না, অথচ পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে তাই দেখছে সবাই, আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। সত্যি ভাই, আমি বোধহয় বুড়ি হয়ে যাচ্ছি...'

আরেক মেয়ে, চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত ভাব, বলল, 'পুরানো দুই বন্ধু বার্নি আর লুকার সঙ্গে কাল রাতে পার্টিতে ছিলাম, ভোরের দিকে আমার স্বামী এমন একটা সিন-ক্রিয়েট করল না! বলে কিনা, তার চোখের আড়ালে ওদের সঙ্গে যা করেছি, তার সামনেও এখন তাই করতে হবে! কেমন উদ্ভট আবদার, ভাবা যায়!'

আরেকজন রানার পিছন থেকে বলল, 'পিয়ার্তো-র শেষ ফিল্মটা প্রথম আট হপ্তায় আশি মিলিয়ন কামিয়েছে, কিন্তু সে যিশুর কিরে খেয়ে বলছে সব টাকাই নাকি খরচা হয়ে গেছে সাবেক চার বউকে খোরপোশ দিতে।'

রানা ওর নিজের কাজের কথা ভাবছে। লুসিন্ডা লাজুলি যদি ওয়াসিম মালিকের দলে নাম লিখিয়ে থাকে, প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর মেয়ে তৃষার জন্যে সেটা মারাত্মক একটা দুঃসংবাদই বলতে হবে। প্রথমবার সে দেখা করার কথা দিয়েও নির্দিষ্ট জায়গায় আসেনি, তারমানে এই নয় যে সে লাজুলিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। হয়তো আইএসআই এজেন্ট বা পুলিসের ভয়েই আসেনি। মোটকথা, তৃষা আবার লাজুলির সঙ্গে যোগাযোগ করবে না, এটা ধরে নেয়া ঠিক হবে না। আর মেয়েটা লাজুলির সঙ্গে দেখা করতে এলেই ওয়াসিম মালিকের এজেন্টরা খপ করে ধরবে তাকে, চার্টার করা বিমানে তুলে পাঠিয়ে দেবে পাকিস্তানে। 'লাজুলিকে তুমি কতটুকু চেনো?' রফিক ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিনি বলাটা ঠিক হবে না, মাসুদ ভাই,' বলল রফিক। 'তাকে নিয়ে ট্যাবলয়েডগুলোয় যা লেখা হয়, তার বেশি খুব কমই

জানি।'

'জানার উপায়?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো বা ইনসাইড স্টোরি?' মাথা নাড়ল রফিক। 'এ মেয়েকে শুধু আকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে, মাসুদ ভাই। নিজে কাছে না এলে ওর নাগাল পাওয়া অসম্ভব।'

'মানে, খুব অহংকারী?'

'না!' মাথা নাড়ল রফিক। 'বলতে চাইছি, হাই সোসাইটির মেয়ে-হাই মানে যতটা হাই হতে পারে। ওর সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে হলে বিশেষ একজন হতে হবে আমাকে-যেমন ধরুন, সুপারহিট কোন সিনেমার প্রোডিউসার, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত কোন প্রতিভা, কিংবা অত্যন্ত বিখ্যাত কোন শিল্পী...'

'কিন্তু ওয়াসিম মালিক কি তাঁদের দলে পড়ে?'

'মাসুদ ভাই, এই ব্যাপারটা সত্যিই ব্যতিক্রম!' বিমূঢ় ও অসহায় বোধ করছে রফিক।

'ব্যতিক্রম? নাকি মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেইল করছে ওয়াসিম মালিক?'

প্রশ্নটা শুনে মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়ল না রফিক, কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল।

'ওদের দু'জনের সম্পর্কটা ঠিক কি, জানা দরকার,' বলল রানা। 'এত সুন্দর, এত টাকা, এ-ধরনের মেয়েকে কাজ করতে হয় না। অথচ মালিকের নির্দেশ মত কাজ সে করছে। আশ্চর্য নয়?'

'খুবই,' বলল রফিক। 'গত বছর ফ্যাশন ম্যাগাজিন আর কলামিস্টরা লাজুলিকে গো-গো গার্ল নির্বাচিত করেছে। প্রতি মাসে নতুন মোটরসাইকেল কেনে, আর তিনমাস পর পর গাড়ি বদলায়। মন দিয়ে যদি রিপোর্টিং-এর কাজ কখনও করে, পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। তবে না, আইএসআই নেটওঅর্কের সঙ্গে তার কোনও লিঙ্ক আমরা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।'

ব্যান্ড থামল কিছুক্ষণের জন্য, নাচিয়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের টেবিলে ফিরে এলো। ওয়াসিম মালিক আর তার দলকে আবার রানা দেখতে পাচ্ছে। তার টেবিলকে ঘিরে রীতিমত একটা ভিড় জমে উঠেছে, সেই ভিড়ের দিকে হেঁটে আসতে দেখা গেল লুসিন্ডা লাজুলিকে। যে-কোন কারণেই হোক মুখে হাসি নেই, খানিকটা গম্ভীর।

'লাজুলি!' একটা মেয়ে চিৎকার করে বলল। 'মসিয়ো মালিকের সঙ্গে তুমি সেই খেলাটা খেলো আজ। ভোগ, স্টাইল, লাইফ, ফ্যাশন ম্যাচ—সব ম্যাগাজিনের ফটোগ্রাফাররা রয়েছে। মসিয়ো মালিক, আপনার কাছে অস্ত্র আছে তো?'

পুরুষালি ভরাট গলায় হাসল মালিক। 'বলো কি, সামান্থা! সঙ্গে পিস্তল না থাকলে মনে হবে ট্রাউজার পরতে ভুলে গেছি!'

'লাজুলি! ওহ্, লাজুলি!' সামান্থা প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করছে। 'হ্যাঁ বলে ফেলো, ভাই!' দু'সেকেন্ড থেমে দম নিল সে। 'কি, রাজি তো?'

সামান্থাকে চিনতে পারছে রানা, তার নানা রকম যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা ছেপেই প্যারিসের কিছু সিনে-ম্যাগাজিন টিকে আছে বাজারে। তবে দক্ষ অভিনেত্রী সে, নায়িকা হিসেবে পাঁচ কি ছ'নম্বরে আছে টানা তিন বছর।

'তোমার সেই সরু-উ-উ সিগার, হানি? সঙ্গে আছে তো?'

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল লাজুলি। সে তাকিয়ে আছে ওয়াসিম মালিকের দিকে, চোখে কঠিন দৃষ্টি। সহাস্যে পাল্টা দৃষ্টি হানছে মালিকও, তবে হাসিটায় কৌতুক বা আনন্দের চেয়ে নির্দয়তার ভাবটাই যেন বেশি ফুটে আছে। রানার প্রফেশনাল চোখে, পনেরো মিনিট আগের দু'জনের সেই মিষ্টি সম্পর্কটায় কাটল ধরে গেছে।

'দেখুন কি ঘটে!' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল রফিক।

'আজ সন্ধ্যায় সম্ভবত ম্যাডমোয়াজেল লাজুলির মূড নেই।'

বলল ওয়াসিম মালিক, শান্ত কণ্ঠস্বর, কিন্তু চ্যালেঞ্জের রেশটুকু স্পষ্ট।

বোঝাই যাচ্ছে, নানা ছল ও কৌশলের সাহায্যে এমন একটা কিছু করাতে চাওয়া হচ্ছে যেটা করতে উৎসাহী নয় লাজুলি।

'তুমি আমাদের আবদার রক্ষা করবে না?' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল সামান্থা।

লাজুলিকে এখন রীতিমত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'তোমার মধ্যে আজ আমি একটা বেপরোয়া ভাব লক্ষ করছি, সামান্থা,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'খুশি হই খেলাটায় তুমি যদি আমার ভূমিকায় দাঁড়াও।'

'ধূত, কিসে আর কিসে! আমি কি লুসিন্ডা লাজুলি—অক্ষত কুমারী, রাজপুত্রদের মানসকন্যা?' কে বলবে উত্তরটায় কেন এত ঝাঁঝ!

এবার ফটোগ্রাফাররাও মেতে উঠল। একজনকে বলতে শোনা গেল, 'বিলিয়ন ডলার বাজেটের ছবিতে নায়িকা হতে না চেয়ে যে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন, মসিয়ো মালিক চুল পরিমাণ ভুল করলে তারচেয়ে বড় খবর তৈরি হবে। প্লীজ, ম্যাডমোয়াজেল, প্লীজ!'

মেয়েটা হঠাৎ শিরদাঁড়া খাড়া করল, উঁচু করল মাথাটাও। 'ওহ্, হেল, অল রাইট। আশা করি আজ তোমার নিশানা ঠিক থাকবে, ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে বলল সে, চোখের আগুন যেন দীর্ঘদেহী ওয়াসিম মালিককে পুড়িয়ে দেবে।

'কিন্তু লাজুলি,' হেসে উঠল মালিক, 'তুমি জানো আমার বুলেট ঠিক সেখানেই লাগে যেখানে আমি লাগাতে চাই।'

আর একটাও কথা না বলে ডানাকাটা ফ্রেঞ্চ পরী ঘুরল, গুনে গুনে ত্রিশ কদম হেঁটে চলে এলো হলরুমের প্রায় মাঝখানে। পিছন থেকে যে-সব মেয়ে তার হাঁটাটা দেখল, তাদের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু করল, আর পুরুষ যারা দেখল তারা আগামী দু'চারদিন এই একই দৃশ্য বারবার কল্পনায় দেখতে

পাবে আর কি যেন না পাওয়ার কষ্ট ভোলার জন্যে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। এমন সুডৌল গুরুনিতম্বে চঞ্চল তরঙ্গমালা খুব কমই দেখা যায়। কামরার ওই প্রান্তের নারী ও পুরুষ নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত আরেক দিকে সরে গেল। একজন ওয়েটার বড় আকারের একটা বোর্ড বয়ে নিয়ে এলো, ব্যাকস্টপ হিসেবে কাজে লাগবে। রিভলভার বের করে পরীক্ষার জন্যে চেম্বার ঘোরাল ওয়াসিম মালিক। প্যাকেট থেকে ছোট আকারের একটা চুরুট বের করে ধরাল লাজুলি, দাঁত দিয়ে এমন ভঙ্গিতে কামড়ে ধরল যেন দুনিয়ার কোন কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। টিনের চালে অকস্মাৎ ঝম ঝম বৃষ্টির মত হাততালি পড়ল এক পশলা ।

রানা ভাবছে, এই অ্যাসাইনমেন্টে আমার একমাত্র কনট্যাক্ট আমারই চোখের সামনে পাকিস্তানী স্পাইমাস্টারের গুলি খেয়ে মারা গেলে সাত মহাদেশের সবচেয়ে বড় উজবুক বলা হবে আমাকে। কিভাবে এই বিপজ্জনক খেলা বন্ধ করবে জানে না, তবে বাধা দেয়ার তাগাদা নিয়েই এগোল ও। পাশ থেকে ওর হাত ধরে থামাল রফিক। 'চিন্তা করবেন না, মাসুদ ভাই। মালিক কখনও মিস করে না।'

'প্রশ্ন সেটা নয়।' রানা ক্ষুব্ধ। 'মেয়েটা ভয়ে কুঁচকে আছে।'

তবে রানার ইতিমধ্যে দেরিও হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল মাথা নত করে হাতের অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করছে মালিক, পরমুহূর্তে ঝট করে সেটা তুলে গুলি করে বসল বলতে গেলে না তাকিয়েই।

লাজুলির চুরুটের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, করতালি ও উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ল হলরূম। আরও দু'বার গুলি করল মালিক, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলার জন্যে চিংড়ি মাছের মত লাফালাফি করতে দেখা গেল ফটোগ্রাফারদের। এই মুহূর্তে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, চুরুটের শুধু ছোট্ট ভাঙা একটা টুকরো মেয়েটার ঠোঁট থেকে ঝুলছে। মালিক তার হাতটা তুলল, চোখ

বরাবর ব্যারেল তুলে লক্ষ্য স্থির করল, তারপর কি ভেবে নামিয়ে নিল অস্ত্রটা।

'নোড়ো না, ম্যাডমোয়াজেল,' মালিকের গলায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে পাকিস্তানীসুলভ উগ্র মেজাজ।

'ব্র্যান্ডিটা ছেড়ে দাও, পাপিষ্ঠ, আরও নিখুঁত হবে তোমার নিশানা,' খোঁচা মারতে বা তেজ দেখাতে লাজুলিও কম গেল না, চুরুটের টুকরোটা আবার ঠোঁটে আটকাল সে। শেষ গুলিটা করার আগে দীর্ঘ সময় নিল মালিক। কামরার ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা, সবাই যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। তারপর বিস্ফোরণের আওয়াজটা সবারই পিলে চমকে দিল। টুকরো চুরুট এখনও লাজুলির ঠোঁট থেকে ঝুলছে। মালিক লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে।

'আজ রাতের মত এই-ই যথেষ্ট,' বলল লাজুলি, ভিড়টার দিকে ফিরে আসছে সে। 'তবে চুক্তির কথাটা কিন্তু ভুলেও ভুলো না। তোমার ব্যর্থতা মঙ্গলসূচক হলে বারোটা বোতলের এক কেস শিভাস রিগাল পাঠাতে হবে আমার ঠিকানায়, আর ব্যর্থতার পরিণতি ভয়াবহ হলে দশ হাজার গোলাপ।'

রানার নজর তীক্ষ্ণ, লক্ষ করল শ্যাম্পেনের গ্লাসটা খালি করার সময় লাজুলির হাতটা কাঁপছে; ওয়েটারকে ডেকে আরও একটা গ্লাস নিল সে।

'চলো, এবার সবাই ওপরতলায় গিয়ে আতসবাজি পোড়ানো দেখি,' মেয়েটা নিজেও বোধহয় বুঝতে পারছে না যে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক জোরে, প্রায় চিৎকার করে কথা বলছে। রানা সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট নয়, তারপরও স্পষ্ট টের পাচ্ছে প্রচণ্ড একটা চাপের মধ্যে রয়েছে লাজুলি, সম্ভবত কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দিয়ে অনভিপ্রেত কিছু করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

লাজুলির কথা শুনে হলরূম খালি হয়ে যাচ্ছে, সবাই একটা মন্থরগতি স্রোতের মত সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

'ওপরতলায় কি?' রফিককে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা যেহেতু এলিটদের একটা ক্লাব, প্রতিদিন একই সঙ্গে বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়,' বলল রফিক। 'পিয়ার্স দো পোরশে, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে দামী ও বিতর্কিত ভাস্কর, তাঁর লেটেস্ট শিল্পকর্ম প্রদর্শন করবেন। দর্শকদের চোখের সামনে শিল্পকর্মটি বিস্ফোরিত হবে—সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কি যেন একটার প্রতীক বা সংকেত—ঠিক কিসের, ভুলে গেছি।'

রানা অন্যমনস্ক, গুরুত্ব দিল না, বলল, 'আর কিছু ঘটার আগে লুসিন্ডা লাজুলির সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

চার

ভিড়ের ভেতরও অনায়াসে লাজুলির পিছু নিতে পারল রানা। কার্পেট মোড়া চওড়া ধাপ বেয়ে আগেই মেয়েটাকে উঠতে দেখেছে ও। ওর দৈহিক গঠন, পেশির কাঠিন্য ও অ্যাথলেটসুলভ নড়াচড়া পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য করল লোকজনকে, আর মেয়েরা তাকাবার পর চোখ ফেরাতে পারল না। কয়েকটা মেয়ে চোখাচোখি হতে হাসল, দু'একজন চোখে-মুখে আমন্ত্রণ ও প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চাইল, আগে যেন কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই না? প্রত্যেককেই সবিনয় হাসি উপহার দিল রানা, নিজেকে মুক্ত রাখল এই কথা ভেবে যে হাতে জরুরী একটা কাজ রয়েছে।

রানা ঘুরে গেছে, তবে ওকে কাভার দিচ্ছে রফিক। রফিকের

চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াসিম মালিক, উপস্থিত আরও অনেকের মত তার চোখ দুটোও স্থির হয়ে আছে রানার চওড়া পিঠে। রফিক তাকে শোকরানের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করতে দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে নাদুসনুদুস শোকরান পিছু নিল রানার।

ওয়াসিম মালিকের ফাইল পড়া আছে রফিকের। পাকিস্তানের লারকানা, খায়েরপুর আর শুক্কুর এলাকার ওঅরলর্ড ছিল ওর আব্বাজান সালাউদ্দিন মালিক। জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরিবার জ্যাকোকাবাদের আরও অনেক উত্তরে বেশ বড় একটা জনপদ বিনা খাজনায় দান করে নিজেদের এলাকা থেকে উপদ্রবটাকে তাড়ায়, পরে নিজেকে সেই জনপদের আফিম ব্যবসার রাজা বলে ঘোষণা করে সালাউদ্দিন। তার ছেলে সতেরো বছর বয়সে করাচী সিটি কলেজের উঠতি সন্ত্রাসীদের লীডার হয়ে ওঠে, আঠারো বছর বয়সে প্রথম খুন করে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী এক ছাত্রকে। এই ছাত্রটির বাবা প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ পরিবারের পুরনো শত্রু হওয়ায় বিচারে বেকসুর খালাস পায় ওয়াসিম। নেওয়াজ শরীফের আমলে তার কুকীর্তি এবং সামরিক ট্রেনিং চলতে থাকে পাল্লা দিয়ে। প্রাইভেট একটা সামরিক কলেজে ভর্তি হয় সে, চার বছরের ইন্টেলিজেন্স কোর্সও কমপ্লিট করে, পরে নেওয়াজ শরীফের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ধরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক শাখায় চাকরি নেয়, যদিও ইতিমধ্যে বাবা মারা যাওয়ায় পারিবারিক আফিম ব্যবসাও তাকে দেখাশোনা করতে হত। প্রধানমন্ত্রী হয়তো জড়িত ছিলেন না, তবে ওই আমলে তাঁর জন্যে হুমকি হয়ে ওঠা পিপল্স্ পার্টির সন্ত্রাসীরা একের পর এক খুন হয়েছে। লোকে বলে, প্রতিটি খুন মালিক নিজ হাতে করেছে।

তার সম্পর্কে রফিকের মূল্যায়ন হলো, এসপিওনাজ জগতে একটা দানবের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে সে তার মাসুদ ভাইয়ের নিরাপত্তার জন্যে মোটেও চিন্তিত নয়। এরকম দানব হয়ে ওঠা বা

উঠতে চাওয়া অনেক ওস্তাদ স্পাইয়ের সঙ্গে লড়তে হয়েছে ওঁকে, আজ কেউ তারা বেঁচে নেই। তার বিশ্বাস, মালিককেও সরে যেতে হবে। তবে দু'জনের লড়াইটা যে শতাব্দীর সেরা একটা দর্শনীয় ঘটনা হবে, এ-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

রফিককে রানা এজেন্সির অন্যান্য এজেন্টদের তুলনায় একটু অন্যরকমই বলতে হবে। লড়াইটা এড়িয়ে যেতে রানাকে সাহায্য করার কথা ভাবছে না সে। বরং চাইছে লাগুক সেয়ানে-সেয়ানে, লড়াইটা উপভোগ করা যাবে।

ইতিমধ্যে পেন্টহাউসে পৌঁছেছে রানা। লোকজন টেরেসে ভিড় করছে ক্যানভাসে ঢাকা বড় আকারের একটা বস্তুকে ঘিরে। সংখ্যায় বাড়তে থাকা ছোট ছোট জটলার আমোদ শিকারী এই সব লোকজনের ভেতর হলুদ ঝুঁটি খুঁজছে ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল। ভাস্কর মহাশয়ের থিওরি শুনছে একদল লোক, লম্বা সুগঠিত পায়ের অধিকারিণী স্বর্ণকেশী মেয়েটি তাদের মধ্যে নেই। রূফ গার্ডেন ও সার্ভিস বার-এর পাশে একটা ছায়াকুঞ্জে, লতা-পাতায় প্রায় আড়াল করা একটা টেবিলে একা বসে আছে সে। চেহারা ও আচরণই বলে দিল, খুব নার্ভাস। হাতব্যাগের সমস্ত জিনিসপত্র টেবিলে ছড়ানো, সেগুলোর ভেতর কি যেন খুঁজছে সে। জিনিসগুলো আবার ব্যাগে ভরার সময় আরও যেন অসহায় আর ক্লান্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। আঘাত করার জন্যে এই বেসামাল অবস্থাটাকেই বেছে নিল রানা।

'মাফ করবেন, ম্যাডমোয়াজেল,' বলল ও, 'এমন কি হতে পারে না যে আগে আমাদের দেখা হয়েছে?'

কপালের রেখায় বিরক্তি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেয়েটা। রানাকে দেখামাত্র অসহিষ্ণুতা মুছে গিয়ে নির্ভেজাল আতঙ্ক ফুটে উঠল চোখে। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল, ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'প্লীজ, আমি চাইছি না ঠিক এই মুহূর্তে কেউ আমাকে বিরক্ত করুক। দেখতেই পাচ্ছেন, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত।'

'সম্ভবত নিস-এ, গত মরশুমে? না, ভুল হলো। মোনাকো...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মোনাকোয়।' রানার ঠোঁটে বিনয়ী ভদ্রলোকের হাসি। কিন্তু যে মরুভূমিতে বাংলাদেশ বিমানের একশো পঞ্চাশজন আরোহীকে খুন করতে পাঠিয়েছিল ওয়াসিম মালিক, লুসিন্ডা লাজুলির চোখে এই মুহূর্তে সেই মরুভূমির উত্তাপ ও রুক্ষতা দেখতে পেল ও। 'কিংবা হয়তো এই মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক আগের ঘটনা, এলিসি প্রাসাদ থেকে বেশি দূরে নয়?' প্রশ্নের সুরে বলল ও, চোখে-মুখে অমায়িক ভাবটা ধরে রাখছে।

এবার এত সুন্দর একটা হাসি দিল লাজুলি, কৃত্রিম অথচ নিখুঁত, রানা স্বীকার না করে পারল না যে ধাপ্পা দেয়ার অভিনয়ে ওর চেয়ে কোন অংশে কম যায় না সে। তবে হাসির এই মুখোশে মুখ ঢাকার আগে তার চোখের তারায় ভয়টা আগেই দেখা হয়ে গেছে ওর। আর জানে, লুসিন্ডা লাজুলির মত মেয়েরা সহজে ভয় পাবার পাত্রী নয়।

এই মুহূর্তে লাজুলির দৃষ্টি রানার ওপর ঘোরাফেরা করছে; ওজন, মাপ, দর, দৌড়, শ্রেণী, চরিত্র ইত্যাদি যা কিছু জানার জেনে নেয়ার চেষ্টায়। পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে, টের পেয়েই সেটাকে দমিয়ে রাখার জন্যে পেশাদারি নির্লিপ্ততার সাহায্য নিল রানা। তবে কাজটা সহজ হলো না। এই মেয়ের মধ্যে কি যেন একটা আছে। সফিসটিকেশনের কোন অভাব নেই, কিন্তু তার তলায় লুকিয়ে থাকা একটা বন্যপ্রাণীর অস্পষ্ট আভাস আরও বেশি প্ররোচিত করছে ওকে।

এ দুঃসংবাদই, নিরাসক্ত মন নিয়ে ভাবল রানা। কারণ রাত শেষ হবার আগেই ওর হাতে ভুগতে হবে মেয়েটিকে। তবে প্রশ্নের জবাব তাড়াতাড়ি দিলে দু'জনের জন্যেই ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ঢং বা অভিনয় ছাড়াই নিজেকে চমৎকার সামলে নিয়ে হেসে উঠল মেয়েটা। 'আহ্, মসিয়ো মাসুদ রানা। আমি কি সত্যি একটা

দুর্দান্ত বেশ্যা নই?' চোখের তারায় সাগরের সবুজ এত বেশি গাঢ় যে সেখানে তার উল্লাসের গভীরতা মাপা গেল না; হাসার সময় মাথাটাকে পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে ঝাঁকি খাওয়ানোর সেই চমৎকার ভঙ্গিটা আবার দেখার সুযোগ হলো রানার, কানে বাজতে থাকল শ্রুতিমধুর, পরিচ্ছন্ন, প্রাণবন্ত আর যৌনাবেদন সৃষ্টিকারী শব্দটা। 'গোপন কথাটা আপনাকে বলছি। আমার জন্মই হয়েছিল মঞ্চে উঠে দর্শকদের পাগল করার জন্যে, কিন্তু আমার বাবা-মা প্রস্তাবটা বাতিল করে দেয়।'

'আপনি আমার নাম জানায় ভালই লাগছে,' ভদ্রতা দেখিয়ে বলল রানা। 'তবে ব্যক্তিগত বিষয় অবগত হবার বিপজ্জনক সুবিধে ভোগ করেন দেখে ভয়ও লাগছে।'

'ভয় লাগছে, আপনার মত সংযমী সুন্দর একটা জানোয়ারের? আপনার গোটা অস্তিত্ব আভাস দিচ্ছে বিপদের সঙ্গেই বসবাস করেন। তাছাড়া,' চোখ বড় বড় করল, 'আপনি যদি অ্যাড-ভেঞ্চারাস না-ই হন, জুয়ায় বসে ধার নেয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে গড়িমসি করছেন কেন। বিশেষ করে ধারটা যখন ওয়াসিম মালিকের মত লোকের কাছ থেকে নিয়েছেন?'

লাজুলির দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ। রানা সিদ্ধান্ত নিল প্রতিবাদ করবে না। এটাই যদি তার গল্প হয়, সত্যি কি মিথ্যে এখুনি তা যাচাই করা সম্ভব নয়। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ইঙ্গিতে এক ওয়েটারকে থামতে বলল, দু'জোড়া চোখকে অনায়াসে ফাঁকি দিয়ে শ্যাম্পেনের ফেনা উপচানো গ্লাসে ছোট্ট একটা ট্যাবলেট ফেলল, ট্রে থেকে তুলে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে। 'আপনাকে আমি ক্ষমা করলাম। আসুন সমস্ত জুয়াড়ীদের স্বাস্থ্যপান করি।'

মাথা নাড়ল লাজুলি, তবে ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। 'না, মসিয়ো, এ কেমন দেখায়...'

'এ আমার আন্তরিক অনুরোধ,' বলল রানা, মায়াভরা চোখ দুটোকে দায়িত্ব দিয়েছে মেয়েটাকে সম্মোহিত করার। কৌশল

হিসেবে তেমন সূক্ষ্ম কিছু নয়, তবে ফল দেয়ার কথা। জড়িয়ে ধরে এলিভেটরে ঢোকাতে হবে লাজুলিকে, লোকজনকে বলতে হবে–আমার সঙ্গিনী একটু বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলেছে। খোলা বাতাসে নিয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

'জানোয়ার বলার পরও যে প্রতিবাদ করে না, উল্টে ক্ষমা করার কথা বলে, তার অনুরোধ তো ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।' যেন খুব মজা পাচ্ছে, অন্তত লাজুলির হাসিটা সে-কথাই বলছে। 'কিন্তু তা আমি পারছি না কেন? আপনার মধ্যে আছেটা কি?' গ্লাসটা নিল সে। রানার বাড়ানো গ্লাসে নিজেরটা ছোঁয়াল। 'কে আপনি, মাসুদ রানা?' দু'জনে এক যোগে যখন যে যার গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছে, লাজুলির পিছনের আয়নায় চোখ পড়তে রানা দেখতে পেল ওয়াসিম মালিকের পোষা সাপ শোকরানকে। ওদেরকেই দেখছে সে, তবে কাছে আসার কোন লক্ষণ নেই। রানার মত লাজুলিও দেখতে পেয়েছে তাকে।

ঠোঁটের কাছে স্থির হয়ে গেল গ্লাস, লাজুলির চোখে সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটল, তবে তা এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে। মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল রানা। চুমুক না দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে নিল লাজুলি।

রানার প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে শোকরানকে লাজুলি ভয় পেল দেখে পুরানো একটা চিন্তা আবার ফিরে এলো মনে–আইএসআই কি ব্ল্যাকমেইল করছে মেয়েটাকে? এই ব্যাপারটা জানা দরকার, তাই শ্যাম্পেনে লাজুলির চুমুক দেয়াটাও জরুরী।

রানার চোখে-মুখে তাকিয়ে থেকে কি খুঁজে পেল কে জানে, ভয় ভয় ভাবটা মুছে ফেলে হেসে উঠল লাজুলি, যেন কি একটা অভয় বা প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভারি খুশি, তারপর গ্লাসটা আবার তুলল ঠোঁটের কাছে।

'চিয়ার্স,' বলেই নিজের গ্লাসে চুমুক দিল রানা, আশা করছে

মেয়েটা ওকে অনুকরণ করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চলে গেল। স্ট্যাচুটা উন্মুক্ত করা হয়েছে। দাঁতে দাঁত চাপল রানা—কাকে অভিশাপ দেব! আলোটা আর এক সেকেন্ড দেরিতে নিভলে ট্যাবলেটটা এতক্ষণে লাজুলির পেটে নেমে যেত।

অন্ধকারে রূপ-যৌবনের মোহিনী শক্তি কাজে আসছে না, তবে লাজুলির হাসিতে বিশেষ এক ধরনের হরমোনকে উত্তেজিত করার উপাদান নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে তার ভূমিকা সম্পর্কে প্রবল সন্দিহান হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ এরকম উত্তেজনা বোধ করবে কেন রানা। হাসতে হাসতে বলল সে, 'নিয়তি বোধহয় চাইছে না পরস্পরের বন্ধু হই আমরা, মসিয়ো রানা।'

চোখ ধাঁধানো বিভিন্ন রঙের আলো শুধু উঁচু সিলিংটাকে উদ্ভাসিত করে তুলল। স্ট্যাচুটা, শিকল দিয়ে বাঁধা নগ্ন এক দানব, শিল্পীর ভাষায়—অত্যাচারী পুরুষজাতির প্রতীক। দানবের পায়ে চাকা লাগানো আছে, রশি দিয়ে বেঁধে সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অত্যাচারিত পাঁচটা খুদে মূর্তি—তারাও নগ্ন, তবে পুরুষ নয়। লাউডস্পীকারে ওই পাঁচ নারীমূর্তির খিলখিল হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই হাসির শব্দকে ছাপিয়ে মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ, পটকা ফাটার আওয়াজ। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে দানবের অংশ বিশেষ উড়ে যাচ্ছে বা খসে খসে পড়ছে।

দর্শকরা যে ধরনের মন্তব্য করছে, শিল্পী নিশ্চয়ই এরকম কিছু আশা করেননি। নিজেদের অর্থাৎ পুরুষজাতির সমর্থনে কথা বলছে তারা, নিন্দা করছে মেয়েদের। অশ্রাব্য অশ্লীল দু'একটা মন্তব্যও রানার কানে এলো।

ঠিক এই সময় কাঁচ ভেঙে পড়ার ঝন ঝন শব্দ শুনতে পেল ও। টেরেসে নয়, ওর পাশে। লাজুলির পিছনে, বার-এর আয়নাটা। বাকি গুলির শব্দগুলোও শুনতে পেল রানা—ভোঁতা ঢপ ঢপ ঢপ। পিস্তলটায় সাইলেন্সার লাগানো হয়েছে।

কামরার আরেক দিক থেকে উর্দু বা হিন্দীতে একজন অন্য একজনকে নিচু গলায় বলল, 'টার্গেট সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে টর্চ জ্বেলো না। কে কাকে গুলি করছে গোপন থাকুক।'

ছোট একটা টেবিলের তলায় শুয়ে পড়েছে রানা। ওর এক হাতে পোষ মানা ওয়ালথার পিস্তল, আরেক হাতে লুসিন্ডা লাজুলি, প্রচণ্ড রাগে তড়পাচ্ছে। তবে যতই ধস্তাধস্তি করুক, রানার মুঠো থেকে নিজের কব্জি মুক্ত করতে পারছে না সে।

'মালিক আপনার কেমন বন্ধু, বলুন তো?' বিদ্রূপ করল রানা। 'এইটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই যে অন্ধকারে আমাকে মারতে গেলে সোনার ডিম পাড়া হাঁসটাকে হারাতে হতে পারে?'

এক সেকেন্ডের জন্যে স্থির হয়ে পরমুহূর্তে আবার ধস্তাধস্তি শুরু করল লাজুলি। কোন লাভ হচ্ছে না দেখে রানাকে কামড়াবার চেষ্টা করল। ভাঁজ করা কনুইটা মুখের ভেতর ঢোকাতে বরং সাহায্যই করল রানা, দুই চোয়ালের ফাঁকে না আঁটায় দাঁত বসাবার সুযোগ পেল না লাজুলি। তার ব্যর্থতায় হেসে উঠল রানা। ওই শব্দটাকে লক্ষ্য করে আরেকটা গুলি হলো। গুলিটা কাছাকাছি আসেনি, ফলে আবার হাসি পেল ওর।

'আপনি উন্মাদ!' ওর পাশ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা। 'ওদেরকে আপনি এদিকে গুলি করতে বলছেন!'

ইতিমধ্যে টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, শুনতে পেল পরবর্তী বুলেটটা ফেলে আসা টেবিলের একটা পায়ায় লাগল। লাজুলি আগের চেয়ে শান্ত, পাশে ধরে রাখতে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। ভাস্কর্যশিল্পীর ভাষণ আবার শুরু হলো, সেই সঙ্গে বিস্ফোরককে আগুন দেয়া হলো–নগ্ন দানব অর্থাৎ পুরুষজাতির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্নকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হাততালির শব্দ শুনে বোঝা গেল, একা শুধু মেয়েরাই উৎসাহ বোধ করছে। ক্রল করে এগোচ্ছে রানা ও লাজুলি, এক টেবিলের তলা থেকে আরেক টেবিলের তলায়। শেষ গুলিটা রানার প্রায় ঘাড় ছুঁয়েও ছুঁলো না।

এর মানে হলো, শত্রুরা ওকে চোখেচোখেই রাখছে, হারিয়ে ফেলেনি।

'এ তো পিস্তলের শব্দ, মসিয়ো!' একজন ইংরেজ চেঁচিয়ে উঠল। 'ব্যাপারটা বেশ কিছুক্ষণ থেকে লক্ষ করছি। কেউ কিছু বলছে না কেন? এখানে কি গ্যাঙ ওঅর শুরু হয়েছে?'

'এই, কে আছ,' আরেকটা গলা শোনা গেল, ফ্রেঞ্চ। 'মাতালটাকে চুপ করাও।' কামরার মেঝে থেকে ভেসে এলো দ্রুত পদশব্দ।

ইংরেজ লোকটা মাতাল ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্যি, দর্শকদের মধ্যে একমাত্র সে-ই টের পেয়েছে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি করা হচ্ছে। লোকটা আবার প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে থেমে গেল—নিশ্চয়ই কেউ তার পেটে ঘুসি মেরেছে।

কাকে লাগতে কাকে লাগবে, এই ভয়ে ওয়ালথারটা ব্যবহার করতে পারছে না রানা, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আরও একটু শান্ত হলো লাজুলি। এখন যদি রানা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করে, না দাঁড়িয়ে তা পারা যাবে না, আর দাঁড়ালেই খোলা টেরেসের বাইরে বিস্তৃত আকাশের গায়ে ওর কাঠামোটা পরিষ্কার ফুটে উঠবে। তাছাড়া বোঝা হিসেবে সঙ্গে মেয়েটা থাকায় দ্রুত সরে যাওয়াও সম্ভব নয়।

পাশে লাজুলির নিঃসাড় পড়ে থাকাটা সন্দেহজনক লাগছে রানার। অস্ত্রধারীদের পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে বড় বেশি কাছে চলে আসছে। আরেকটু পরই ওকে পেয়ে যাবে তারা।

অকস্মাৎ আকাশে বিস্ফোরিত হলো লাল একটা আভা। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে, প্রতিটির আওয়াজ আগেরটার চেয়ে বেশি। ভাস্কর্যশিল্পী পিয়াস ডি পোর্চি দানবটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

লাল আভায় খুনীদের একজনকে এক পলকের জন্যে দেখতে

পেল রানা। ছুরিটা আগেই বগলের নিচে থেকে তালুতে নেমে এসেছিল। কব্জির একটা তীব্র ঝাঁকুনি দরকার হলো শুধু। পরমুহূর্তে ছুরিটাকে দেখা গেল খুনীর দুই পাঁজরের মাঝখানে। গুঙিয়ে উঠে পড়ে যাচ্ছে লোকটা, স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে কাছে চলে এলো রানা, ধরে ফেলল লোকটাকে–ঠিক যখন শেষ নিঃশ্বাস পড়ছে।

'মেহবুব?' কাছাকাছি থেকে ফিসফিস করল কেউ।

'এই নাও,' বলে মেহবুবের লাশটা তার দিকে ঠেলে দিল রানা। লাশ ও জ্যান্ত শরীরের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হলো। গুলির একটা ভোঁতা শব্দও শোনা গেল। শব্দটাকে লক্ষ্য করে ক্ষিপ্র চিতার মত লাফ দিল রানা। ছুরিটা আগেই উদ্ধার করেছে, এই মুহূর্তে ঘ্যাচ্ করে সেটা সেঁধিয়ে দিল দ্বিতীয় লোকটার বুকে, অপর হাতে তার চুল ধরে স্থির রেখেছে।

রানা আশা করেছিল খুনীদের একজন অন্তত মালিক বা শোকরান হবে, কিন্তু কাছ থেকে লাল আলোর আভায় দেখল এদেরকে আগে কখনও দেখেনি ও।

এরপর ঝট্ করে লাজুলির দিকে ঘুরল রানা। কিন্তু ইতিমধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে সে।

পাঁচ

এগারোতলা পেন্টহাউসেই কোথাও লুকিয়ে আছে লাজুলি, তবে রানা বুঝতে পারছে এই অন্ধকার ও ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজে

বের করা সম্ভব নয়। ঠিক করল নিচে নেমে গেটে দাঁড়াবে ও, বেরুবার সময় ধরবে। সঙ্গে মালিক থাকুক বা পুলিস, যেভাবে হোক রানা এজেন্সির সেফ হাউসে নিয়ে গিয়ে আজ রাত শেষ হবার আগেই ইন্টারোগেট করবে তাকে। কিন্তু এই সময় হঠাৎ একটা দৃশ্য ওর অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিল।

রেইলিং-এর কিনারায়, আলো ঝলমলে এলিসি প্রাসাদের চেয়ে এগারোতলা ওপরে, তিনটে ছায়ামূর্তি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে এই কসরতটার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। ডিফেনিসট্রেইশন। পুরানো এক নির্মম কৌশল, প্রতিপক্ষের কোন লোককে বাগে পেয়ে উঁচু কোন জায়গা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া। সহজে, দ্রুত সারা যায় কাজটা, কারও নিশ্চিতভাবে জানারও উপায় নেই যে লোকটা দুর্ঘটনাবশত পড়ে গেছে, নাকি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। যারা ধাক্কা দেয় তারা মুখ খোলে না, আর যাকে ধাক্কা দেয়া হয় সে মুখ খুলতে পারে না।

তিনজনের মধ্যে একজন একটু আড়ালে রয়েছে, সে লাজুলি হতে পারে; তবে লাজুলি হোক বা না হোক, রানা এই নির্মম খুনটা ঠেকাবার জন্যে ছুটল। স্ট্যাচু বিস্ফোরিত হয়েছে, দর্শকরা অকস্মাৎ ফিরে আসছে টেরেস থেকে—একটা স্রোতের মত রানার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল তারা। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ঘটনাটা ঘটে যেতে দেখল রানা, পনেরো ফুট দূর থেকে কিছুই করার থাকল না। দু'জন মিলে ধাক্কাটা দিল। লোকটা যখন পড়ে যাচ্ছে তাকে চিনতে পেরে মাথাটা বন করে ঘুরে উঠল ওর। মাত্র দু'সেকেন্ড লাগল নিজেকে সামলাতে, কিন্তু ওই দু'সেকেন্ডের মধ্যেই কিনারা থেকে সরে এসে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেছে খুনীরা। ছুটে এসে রেইলিং-এর ওপর পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল ও।

নিচের রাজপথে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। ফুটপাতে জনারণ্যে ঢাকা পড়ে আছে কিনারায় সারি সারি কয়েকশো বা

কয়েক হাজার গাড়ি পার্ক করা, আর রাস্তায় যানবাহনের অবিচ্ছিন্ন মিছিল—এ-সবের মধ্যে রফিককে কোথাও খুঁজে পেল না রানা। হয়তো একজোড়া গাড়ির মাঝখানে পড়েছে, কিংবা ছুটন্ত কোন ট্রাকের পিছনে।

তবে রানা যা আশা করেনি, হঠাৎ লাজুলিকে দেখতে পেল। রাস্তা পেরুবার সময় হাত তুলে ড্রাইভারদের থামতে বলছে সে। রাস্তা পার হয়ে হন-হন করে কিছু দূর হাঁটল, তারপর আলোয় উদ্ভাসিত একটা গ্যারেজের ভেতর ঢুকল। রফিককে এভাবে হারিয়ে রানার মাথায় রক্ত চেপে গেছে, একবার ভাবল লাজুলিকে ইন্টারোগেট না করে সরাসরি ওয়াসিম মালিককে ধরবে কিনা। কিন্তু না, এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ মাথা ঠাণ্ডা রাখা। লাজুলিকেই জেরা করে তথ্য আদায় করতে হবে। ভালই হলো, ওর গাড়িটাও ওই গ্যারেজের পাশে রাখা আছে। রেইলিং-এর দিকে পিছন ফিরতে যাচ্ছে ও, হঠাৎ কাতর একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল কানে।

আবার নিচে তাকাল রানা। রাস্তার ওপারের বিল্ডিংটা ষোলোতলা, সেটার দশতলার গায়ে চওড়া একটা তাক বা থাক দেখা যাচ্ছে। সেই তাকের কিনারায় বসে রয়েছে রফিক—কখনও হাত ডলছে, কখনও হাঁটু।

পরম স্বস্তিতে কয়েক সেকেন্ড কোন কথাই বলতে পারল না রানা। তারপর সকৌতুকে বলল, 'ওখান থেকে তো আর দেশের সেবা করা সম্ভব নয়, রফিক। দাঁড়াও, দেখি কি করা যায়।'

'মাসুদ ভাই, আমার পিছনে জানালা আছে, কিন্তু বন্ধ।'

এই সময় পেন্টহাউসের আলো আবার জ্বলে উঠল। এলিভেটরের দিকে এগোবার সময় একজন ওয়েটারকে থামাল রানা। 'রেইলিং-এর উল্টো দিকে এক ভদ্রলোককে দেখতে পাবে, ফ্রেঞ্চ সরকারের সম্মানী মেহমান। উনি আবার পার্টিতে যোগ দিতে চাইছেন। তুমি একটা মইয়ের ব্যবস্থা করো, প্লীজ।'

*

রানা ওর জাগুয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে ফুটপাতের কিনারায়, মার্সিডিজ নিয়ে তীরবেগে গ্যারেজটা থেকে বেরিয়ে এলো লাজুলি। স্টার্ট দেয়াই ছিল, পিছু নিল রানা। দ্রুত গতিতে অন্যান্য গাড়িকে একের পর এক ওভারটেক করছে মেয়েটা, রানাকেও তাই করতে হচ্ছে, তবে সুযোগ পেলে মার্সিডিজ আর নিজের গাড়ির মাঝখানে তৃতীয় একটা গাড়িকে থাকতে দিচ্ছে যতক্ষণ পারা যায়।

রন্ড-পয়েন্টে বাঁ দিকে যাবার সংকেত দিল লাজুলি, কিন্তু অকস্মাৎ বাঁক নিল ডান দিকে—মার্সিডিজের পিছন দিকটা মাছের লেজের মত এদিক ওদিক ঝাপটা মারার ভঙ্গি করল। কোন রকমে গাড়িটার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল সে। চওড়া অ্যালেক্সজান্দ্রা থার্ড ব্রিজের দিকে যাচ্ছে ওরা। সাদা ক্যাপ ও সাদা দস্তানা পরা এক ট্র্যাফিক পুলিস রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রীতিমত নাচতে শুরু করল, একনাগাড়ে হুইসেল বাজাচ্ছে, গাড়ি দুটো তাকে পাশ কাটিয়ে ব্রিজে উঠল। লাজুলির পিছনে রানা, ব্রিজ থেকে নেমে এলো ওরা।

দুটো গাড়ির দূরত্ব বাড়ল না বা কমল না, আরও একটা ব্রিজ পার হলো ওরা। এদিকটা একেবারেই নির্জন, স্পীড তাই আরও বাড়িয়ে দিয়েছে লাজুলি। তৃতীয় ব্রিজটা কাছে চলে আসছে। নিচে নদীতে জমাট বেঁধে গেছে বেশির ভাগ পানি, সাদা বরফ দেখতে পাচ্ছে রানা। ব্রিজটা প্রায় আধ মাইল লম্বা, সম্ভবত সেজন্যেই ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে অটোমেটিক লাইটের ব্যবস্থা আছে। এর আগের রেড লাইটে লাজুলি থামেনি। ব্রিজের ওপর হঠাৎ লাল আলো জ্বলতে দেখে রানা ধরে নিল এবারও সে থামবে না। থামতও না, কিন্তু উল্টোদিক থেকে বিরাট একটা ট্রাক ব্রিজে উঠে পড়ায় অকস্মাৎ ব্রেক কষতে হলো লাজুলিকে।

ঘণ্টায় সত্তর মাইল স্পীড সামান্য কোন ব্যাপার নয়, অকস্মাৎ

হার্ড ব্রেক করায় ঘুরে গেল মার্সিডিজ, তারপর যেন ডানা গজাল ওটার। বিস্ফোরিত হলো রেইলিং, শূন্যে উড়ল লাজুলির মার্সিডিজ।

রানার জাগুয়ারকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সাত টনী ট্রাক। সাবধানে ব্রেক কষে গাড়িটাকে থামাল রানা ব্রিজ থেকে নেমে এসে কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো নদীর কিনারায়। মার্সিডিজ তখন বরফ ভেঙে একটু একটু করে ডুবছে। ওটার আশপাশে লাজুলিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কাপড় খুলতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল, সময় বাঁচাবার জন্যে বোতাম না খুলে একটানে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল রানা। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে, সাহায্য পাবার কোন আশা নেই; কংক্রিটের ঢাল বেয়ে ছুটল রানা। বরফ বেশ পুরু হয়েই জমেছে, খালি পা পিছলে যাচ্ছে ঘন ঘন। বরফ ভেঙে বিশাল একটা ফাঁক তৈরি করে নদীর তলায় নেমে গেছে মার্সিডিজ, তবে এখনও বুদ্বুদ উঠছে। রানা প্রায় নিশ্চিত, লাজুলিকে বাঁচানো যাবে না। নগ্ন শরীর, পানিতে ডুব দিতে ঠাণ্ডা ছ্যাঁক লাগল সারা গায়ে। নদীটা গভীর নয়, পাঁচ ফুট নিচেই পাওয়া গেল মার্সিডিজের ছাদ। পিছনদিকের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল স্টিয়ারিং হুইলের ওপর কপাল ঠেকিয়ে এখনও ড্রাইভিং সিটে বসে রয়েছে লাজুলি, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্সিডিজ ডুবেছে এক মিনিটও হয়নি, রানার মনে আশা জাগল মেয়েটা হয়তো এখনও মরেনি। দুই বগলের ভেতর হাত গলিয়ে দিল ও, নিজের পিঠ আর কাঁধের শক্তি ব্যবহার করে স্টিয়ারিং কলাম ও হুইল থেকে ছাড়িয়ে আনল লাজুলিকে। দম ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু তাকে ছাড়ল না ও, উঠে এলো পানির ওপর। বরফের কিনারা ধরে এক মিনিট বিশ্রাম নিল ও। তারপর পানি থেকে উঠে এলো, দু'হাতের ভাঁজে লাজুলিকে নিয়ে ফিরে এলো নদীর পাকা কিনারায়। পানি থেকে তোলার পর থেকেই কাশি দিচ্ছে লাজুলি,

কংক্রিটের ওপর শোয়াবার পর ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। জাগুয়ার থেকে মোটা একটা কম্বল এনে বিছাল রানা। নির্লিপ্ত একজোড়া হাত অত্যন্ত ব্যস্ততা ও দক্ষতার সঙ্গে লাজুলির দামী পার্টি ড্রেসটা, বডিস সহ, ছিঁড়ে খুলে আনল। একই পরিণতি হলো পাতলা আন্ডারগার্মেন্টগুলোর। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করার পর আবার তাকে তুলল রানা, তারপর শুইয়ে দিল কম্বলের ওপর। ওটার প্রান্তগুলো ব্যবহার করে গায়ের পানি মুছল, তারপর রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনার জন্যে সারা গায়ে ঘষতে লাগল—অবশ্যই কোমল অংশগুলো বাদে। লাজুলি এখনও চোখ মেলেনি, তবে উঁ-আঁ করে গোঙাচ্ছে। তাকে একা রেখে আবার বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে পানির কিনারায় ফিরে এলো রানা। মার্সিডিজের সামনের সিটের নিচে লাজুলির হাতব্যাগটার স্পর্শ পেয়েছিল ও, কিন্তু তুলে আনতে পারেনি। সেটা আনার জন্যে আরেকবার ডাইভ দিতে হলো ওকে।

কাপড় না পরে, কম্বলের এক ধারে শুয়ে রয়েছে রানা, হাতব্যাগের জিনিসগুলো বের করে পরীক্ষা করছে, এই সময় নড়ে উঠল লাজুলি।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। চোখ মেলে ওর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। চোখাচোখি হতে তিক্ত একটু হাসল। বলল, 'ওখানে তুমি কিছুই পাবে না। কিছু পেতে হলে আমার আরও কাছে আসতে হবে।'

কাছেই ছিল রানা, তবু বলছে যখন দু'ইঞ্চি সরে এসে কোন ব্যবধানই আর রাখল না। লাজুলি ক্লান্ত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথাটা তুলল, একটু ঘুরল রানার দিকে, ভাল করে পজিশন নিয়ে ঠাস করে চড় মারল ওর গালে। 'আমাকে এই অবস্থায় দেখার জন্যে পানি থেকে তুলে এনেছ, তাই না?'

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে ওঠারও সময় পেল না রানা, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল লাজুলি। নিঃশ্বাস ফেলার

ফাঁকে বিড়বিড় করে বলছে, 'তুমিই প্রথম আমাকে দেখলে, রানা! আমার চোখে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ।'

প্যারিসের সবচেয়ে অভিজাত এলাকার ভেতর দিয়ে ছুটছে গাড়ি, পাশের সিটে বসিয়ে লাজুলিকে তার অনেক আস্তানার একটায় পৌঁছে দিচ্ছে রানা। নদীর তীরে মাত্রা ছাড়ানো তেমন কিছু ঘটেনি, তবে লাজুলির আস্তানায় পৌঁছানোর পর ঘটতে পারে। অন্তত লাজুলির আচরণে প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ প্রকাশ পেয়েছে। রানার তরফ থেকে এখনও কোন দুর্বলতার আভাস পাওয়া যায়নি। তবে লাজুলির দাবি যে সত্য, এটা উপলব্ধি করেছে রানা। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে ভাল লাগছে। গর্ব অনুভব করছে। কোন নারীর ভরাট যৌবন আর কেউ দেখার আগে এই যে ও প্রথম দেখার সুযোগ পেল, এ সম্ভবত ওর সেরা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাগুলোর একটা।

গাড়ি চালাবার সময় রানা কোন কথা বলছে না, লাজুলির দেয়া তথ্যগুলো নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করছে। সবচেয়ে বড় খবর হলো, তৃষা চৌধুরী এখনও প্যারিসে লুকিয়ে আছে, আগামী পরশু আবার সে দেখা করতে চেয়েছে লাজুলির সঙ্গে শহরের সবচেয়ে জনাকীর্ণ মার্কেট ডিস্ট্রিক্ট-এ। প্রথমবারও এরকম একটা জায়গায় দেখা করতে চেয়েছিল তৃষা, কারণ হলো বিপদ দেখা দিলে খুব সহজেই যাতে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে। এমনি, কথায় কথায়, প্রথম সাক্ষাতের আয়োজন সম্পর্কে ওয়াসিম মালিককে জানিয়েছিল লাজুলি, তবে কি কারণে কে জানে, তৃষা আসেনি। সেই থেকে খেয়াল করছে, কে বা কারা যেন তার অফিস আর আস্তানা সার্চ করছে। কাজটা ওয়াসিম মালিক করছে, এটা সে সন্দেহ করেনি, কারণ ঘটনাগুলো ঘটার সময় শহরে ছিল না সে।

পার্টিতে এসে হাতব্যাগটা লাজুলি চেকরুম-এ রেখেছিল। ওই হাতব্যাগেই ছিল তৃষার মেসেজটা। লিপস্টিক নিতে চেকরুমে

ঢোকে সে, ব্যাগ খুলে দেখে মেসেজ লেখা কাগজটা নেই। লাজুলি ধরে নেয় কাজটা শুধু ওয়াসিম মালিক কিংবা তার লোকজনই করতে পারে। এই ব্যাপারটা নিয়েই মালিকের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারপর যখন গোলাগুলি শুরু হয়, সে বুঝতে পারে মালিক আর তার গুণ্ডারা একা শুধু রানাকে টার্গেট করছে না, বুলেটগুলোয় তার নামও লেখা আছে। গোটা ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে এমন কি রানার কাছ থেকেও পালাতে চেষ্টা করে সে। এ-সব কথা বলার সময় মাঝে-মধ্যে বিহ্বল হয়ে পড়ল লাজুলি, দু'একবার শিউরেও উঠল।

রানা বুঝতে পারছে, পাগল করার মত একটা মেয়েই বটে। তাকে ওর অসম্ভব ভালও লাগছে। তবে এখন ওকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে লাজুলিকে সত্যি বিশ্বাস করা যায় কি যায় না।

হাত বাড়িয়ে রানার বাহু ছুঁলো লাজুলি। 'এখানে পার্ক করতে পারো। এই গাড়ি ওয়াসিম মালিক চেনে না।' তাকাবার পর রানার শরীর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সে। ছেঁড়া শার্টের আস্তিন গুটানো, পেশিবহুল কাঁধ আর নগ্ন বাহু যেন জাদু করেছে তাকে। তারপর ওর চোখে চোখ রাখল। 'হুম্‌ম্! সত্যি দুঃখ পাওয়ার মত একটা ব্যাপার। আমি তোমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখছি, আর তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাসই করতে পারছ না,' নরম, সকৌতুক কণ্ঠস্বর; আড়চোখে তাকানোর মধ্যে দুষ্টামির ঝিলিক। 'তুমি মানুষটা বোধহয় প্রথমে যুদ্ধ, তারপর শান্তি পছন্দ করো।'

বাঁকের মুখে, গাছপালার নিচে পার্কিং এরিয়া; স্পোর্টস কারটাকে সাবলীল ভঙ্গিতে থামাল রানা। 'আমি এখনও মনে করি তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই বিপজ্জনক।' নিঃশব্দে মুক্তোঝরা হাসিটা ধরে রাখল মুখে, উত্তরের আশায় অপেক্ষা করছে। লাজুলি হাসল, যেন রানার মন্তব্যের গোপন কি একটা অর্থ তার জানা আছে, কিন্তু কোন জবাব দিল না। তখন রানা নিজেই আবার

বলল, 'তবে বিপদটা শুধু একা আমার কিনা জানি না।'

দেখতে পাবার আগেই বাতাসে নদীর গন্ধ পেল রানা, লাজুলির পিছু নিয়ে পাথর বসানো সরু পথ পেরিয়ে এসে ধাপ বেয়ে জেটিতে নামল, থামল এসে শেষ মাথায়। মেয়েটার খালি পা ধাপগুলোয় ভেজা দাগ রেখে এলো, নিবিড় নিতম্বে জড়িয়ে কম্বলটা নাভির কাছে ধরে রেখেছে একহাতে। ছোট্ট গ্যাঙপ্ল্যাঙ্ক হয়ে একটা হাউসবোটে চড়ার সময় রানার বাহু ধরল লাজুলি, লম্বা নখগুলো প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই যেন ডেবে গেল।

প্লেট গ্লাস দিয়ে মোড়া পিকচার উইন্ডো বসানো পুরানো একটা বার্জকে হাউসবোট বানানো হয়েছে। হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করার সময় ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে লাজুলি বলছে, 'এখনও যদি জেনে না থাকো, অচিরেই জানতে পারবে আমার বাবা একজন মিলিওনেয়ার নয়, বিলিওনেয়ার–ফ্রাঙ্কে নয়, ডলারে। স্বভাবতই তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে, এই মেয়ে মা-বাবার কাছে থাকে না কেন? উত্তর হলো, এই মেয়েটা উপলব্ধি করেছে–মুক্ত নীলিমায় একা আর স্বাধীন থাকার জন্যে জন্ম হয়েছে তার।' হাসল সে। 'এখানে কুয়াশা ঢাকা ভোরে একা বসে হিসাব কষি জীবনে কি কি ভুল করলাম, তারপর প্ল্যান আঁটি আরও কি কি ভুল করব।' হাসিটা ম্লান হতে শুরু করেছে, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল, সুর আরও অনেক নরম করে বলল, 'প্রাণ বাঁচালেও কাউকে ধন্যবাদ জানানো আমার জন্যে খুব কঠিন কাজ, মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। কিন্তু...' কথাটা শেষ না করে রানার গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে আনল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল দু'জনেই। গায়ের কম্বল লুটাচ্ছে মেঝেতে। রানার ছেঁড়া শার্ট আরও ছিঁড়ে ফেলেছে লাজুলির নখ।

'না,' শান্ত গলায় বলল রানা, কিন্তু লাজুলির ঝাঁকি খাওয়ার ধরনটা দেখে মনে হলো তাকে যেন চড় মারা হয়েছে।

'আরেকবার বলো!' শরীরে প্রবল উত্তেজনা, আওয়াজটা গোঙানির মত শোনাল।

রানার মনে হলো কথাটা পুনরাবৃত্তি করায় ঝুঁকি আছে। বলল, 'চলো, ভেতরে যাই।'

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে থাকল লাজুলি। শরীরের চাহিদা তাকে স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছে না। রানার মনে হলো, কেউ যেন ওকে—সম্ভবত নিয়তিই— এমন একটা অবস্থায় ফেলেছে যা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে। মেয়েটি একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি।

হাউসবোটের এই কামরাটা বিশাল, পুরোটা মেঝে কার্পেটে মোড়া। ফার্নিচারগুলো সবই সতেরো বা আঠারো শতকের— অ্যান্টিকস। দেয়ালে নামকরা শিল্পীদের পেইন্টিং ঝুলছে, তার মধ্যে ছোট্ট একটা পিকাসোও চিনতে পারল ও।

ধাক্কা দিয়ে রানাকে বিছানার ওপর ফেলে দিল লাজুলি। খাটের কিনারায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত দেখল ওকে। পিছন ফিরল, কয়েক পা হেঁটে হাতব্যাগটা কুড়াল, তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বিছানায় উঠে শুলো রানার পাশে। 'তোমার চোখে এখনও আমি সন্দেহ আর অবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছি।'

'অনুবাদে সামান্য ভুল করছ,' বলল রানা, হাসছে না। 'ওগুলো প্রশ্ন।'

'তোমাকে তো বলেছি,' একটা চাদর টেনে নিজেকে ঢাকল লাজুলি, 'এমনি গল্প করতে করতে তৃষার কথা জানাই মালিককে। তারপর টের পেয়ে যাই, তৃষাকে ওরা কিডন্যাপ করার প্ল্যান করছে। ভাগ্যিস মেয়েটা আসেনি, তা না হলে কি ঘটত ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়...'

'কিন্তু তোমার এত সব কথার মধ্যে একটা প্রশ্নের কোন উত্তর নেই,' বলল রানা। 'ওয়াসিম মালিকের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি?'

'আমার জীবনে কোন বয়ফ্রেন্ড নেই,' বলল লাজুলি। 'এই জন্যে নেই...তুমি যাই মনে করো, ব্যাখ্যাটা একটু সেকেলে–বয়ফ্রেন্ড নেই এই জন্যে যে শরীরে যৌবন আসার পর আমি উপলব্ধি করেছি জীবনে মাত্র একটা পুরুষ দরকার আমার; তাকে বেপরোয়া আর অ্যাডভেঞ্চারাস হতে হবে, সুন্দর হতে হবে, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হতে হবে–ভালবাসবে শুধু আমাকে, যেহেতু আমিও শুধু তাকেই ভালবাসব। কিন্তু আমি যেমনটি চাই, তেমন পুরুষ কোথাও পাইনি। হঠাৎ এক পার্টিতে দেখলাম ওয়াসিম মালিককে। মনে হলো, বোধহয় একেই খুঁজছি। যেচে পড়ে আলাপ করলাম। কথা শুনে মনে হলো, ওর মত অকপট মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। বলল, ওর বাবা ছিল যুদ্ধবাজ–ওঅরলর্ড। আফিম চাষ আর রপ্তানি করে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছে। পারিবারিক ব্যবসা হলেও, ও-সব ছেড়ে সে নিজে পারফেক্ট ভদ্রলোক হওয়ার সাধনা করছে।

'এরকম আরও কত গল্প। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু তারপর একদিন একটা ধাক্কা খেলাম। মালিক বলেছিল, একজন মুসলমান হিসেবে বিয়ের আগে কোন মেয়ের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করা নিষেধ। কিন্তু তার একদল বান্ধবী আমাকে জানাল, তারা নিয়মিতই মালিকের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে আসছে আজ কয়েক মাস ধরে। দ্বিতীয় ধাক্কাটা লাগল ঠিক পরের হপ্তায়, যখন জানলাম পাকিস্তানে তার স্ত্রী আছে–একটা নয়, তিন-তিনটে।'

লাজুলির কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে রানার। তবে মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা সহজে কাটছে না। 'প্রশ্নের আংশিক উত্তর পাওয়া গেল। বাকিটাও বলো–মোহভঙ্গের পরও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছ কি মনে করে?'

'ঘনিষ্ঠভাবে মানে?' ভুরু কোঁচকাল লাজুলি। 'সে আমাকে চুমো খেতে পেরেছে? তৃতীয় আঘাতটা পেলাম, যেদিন উপপত্নী হিসেবে নিজের শ্যাতোয় রাখতে চাইল আমাকে। সেদিনই পাল্টা

আঘাত পেতে হয় তাকে। চড়টা খেয়ে মালিক বলেছিল, তাদের বংশে কোন পুরুষকে কেউ চড় মারলে বদলা হিসেবে চড় মারা হয় না–খুন করা হয়। আমি ভয় পাইনি। তবে হ্যাঁ, ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও তার সঙ্গে মেলামেশা আমি করছিলাম দুটো কারণে। এক, মালিক আমাকে বেশ কয়েকটা এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট লেখার মালমশলা যোগান দিয়েছে। আরও পাব, এই আশায় ওর সঙ্গে সম্পর্কটা টিকিয়ে রেখেছি। দুই, ওকে আমার সন্দেহ হয়। অবৈধ কিসের সঙ্গে যেন জড়িত। কেন যেন মনে হয়, একদিন মালিকই আমার একটা এক্সক্লুসিভ খবর হয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু আজ পার্টিতে যা ঘটল, তার কি ব্যাখ্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তো একটাই,' বলল লাজুলি। 'তৃষা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, এটা জানার পর সে সিদ্ধান্ত নেয়...,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল সে।

'সিদ্ধান্ত নেয় তোমাকে খুন করার?'

'তোমাকে তো বটেই, সম্ভবত আমাকেও,' বলল লাজুলি।

'আমার সম্পর্কে কি শুনিয়েছে তোমাকে?'

'জুয়ায় নাকি প্রচুর হেরেছ তুমি, ধার করেছ মোটা টাকা,' বলল লাজুলি। 'ভাল একটা খবর পাইয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে অনুরোধ করল আমি যেন তোমাকে মার্সিডিজে তুলে ওর শ্যাতোয় পৌঁছে দিই। কেন রাজি হই জিজ্ঞেস কোরো না, কারণ আমি মেয়েটাই এরকম। তারপর তোমাকে পার্টিতে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠি। বুঝতে পারি মালিকের সঙ্গে তোমার কিছু নিয়ে একটা বিরোধ আছে। মালিক বিপজ্জনক, এটা তো আগেই জেনেছি, তোমাকে মনে হলো তারচেয়েও কয়েকগুণ বেশি বিপজ্জনক। সে-জন্যেই পালাবার চেষ্টা করছিলাম। এখন পাপাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে একজন বয়ফ্রেন্ড পাওয়ার বিনিময়ে মার্সিডিজটা হারাতে হয়েছে...,' হঠাৎ লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল

সে। '...এই, তোমাকে কিছু খাওয়ানো উচিত আমার। বলো কি চাও। ব্র্যান্ডি, নাকি শ্যাম্পেন?'

'ভাল হয় যদি কফি খাওয়াতে পারো, তা না হলে আর কিছুর দরকার নেই

লাজুলি কামরা ছেড়ে চলে যাবার পর রানা সিদ্ধান্ত নিল, লাজুলি সম্পর্কে সোহেলকে প্রশ্ন করতে হবে। বলা যায় না, এখানে হয়তো ওকে নিয়ে আসা হয়েছে স্রেফ খুন করার জন্যে। সন্দেহ করার মত অনেক কিছুই রয়েছে। এই যেমন, পিকচার উইন্ডোগুলো। এত রাতে জানালার পর্দা কেউ সরিয়ে রাখে? বিশেষ করে কেবিনে যখন আলো জ্বলছে? এ যেন ওয়াসিম মালিক আর তার গুণ্ডাদের দেখার সুযোগ করে দেয়া যে হাউসবোটে রানাকে ব্যস্ত রেখেছে লাজুলি।

ফিরে এলো কাপড় পরা লাজুলি, হাতে কফির ট্রে। নাইটি পরেছে সে, এত পাতলা যে পরা না পরা সমান। রানাকে কাপটা শেষ করতেও দিল না, আবার আদরে আদরে অস্থির করে তুলল–এটাও তার ভান, অন্তত রানার তাই ধারণা; আসলে সে আদর পেতে চাইছে।

'তোমার কথা যদি সত্য হয়, জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের কাছে আত্মনিবেদন করতে চলেছ তুমি,' এক পর্যায়ে বলল রানা। 'কিন্তু সেটা দুনিয়ার সব মানুষকে দেখিয়ে কেন?' ইঙ্গিতে জানালাগুলো দেখাল।

রানার কথায় কান না দিয়ে অস্ফুট শব্দে গোঙাচ্ছে লাজুলি। তার শরীর মোচড় খাচ্ছে, বিছানায় ঝাঁকি খাচ্ছে পা দুটো, রানার গায়ে নখ বেঁধাচ্ছে। কথাটা আবার বলল রানা । এবার অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল লাজুলি। 'তোমার মনে এত সন্দেহ কেন? জানালায় ওগুলো ওয়ান-ওয়ে গ্লাস–এখান থেকে বাইরের সব কিছু দেখতে পাব আমরা, কিন্তু বাইরে থেকে কেউ আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

'তুমি কিছু মনে করবে, আমি যদি চেক করি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে কামরা থেকে বেরিয়ে এলো রানা। লাজুলির কথাই ঠিক, জানালার বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কামরায় ফিরে এসে রানা দেখল, আবার একটা চুরুট ধরিয়েছে লাজুলি, রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তোমার বন্ধুত্ব পেতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে আমাকে, কঠিন কিছু পরীক্ষায়ও পাস করতে হবে। ঠিক আছে, আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে হঠাৎ ভাল-লাগা পুরুষটির হাতে নিজেকে তুলে দিতে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছি, যতদিন বেঁচে থাকব ভুলব না।'

রানাকে বিনয়ী ও আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল; 'আমাকে একটু ব্যাখ্যা করতে দাও, প্লীজ। আমি সাধুপুরুষ নই, তবে মনটা সায় না দিলে কোন মেয়ের সঙ্গে ভাব করি না। তোমাকে সব ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আরও সময় দরকার হবে আমার, তবে তুমি নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে যে-সব কথা বলেছ তা আমি বিশ্বাস করেছি। তোমার জানা দরকার, ওয়াসিম মালিকের মত আমার জীবনেও অনেক নারী এসেছে, পেশাগত কারণে কারও সঙ্গেই স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তোমার কল্পনার রাজপুত্রের যা বর্ণনা শুনলাম, আমার সঙ্গে তা একটুও মেলে না। কোনদিন আদৌ আমি তোমার বন্ধু হতে পারব কিনা এখনও তা জানি না, আর সেজন্যেই...'

'তোমার ব্যাখ্যা তোমাকে মহৎ করে তুলছে,' বাধা দিল লাজুলি। 'আর মহৎ লোক আমার খুব একটা পছন্দ নয়। কাজেই এ-সব প্রসঙ্গ থাক। এখন বরং তোমার সেই দিকটা নিয়ে কথা বলি যেটাকে ভয়ংকর বললেও কম বলা হয়। বিশ্বাস করো, কোনদিন ভুলতে পারব না–চারদিকে বুলেট ছুটোছুটি করছে, আর তুমি কিনা হাসছ! এটাই কি তোমার স্বভাব? কেউ যখন গুলি করে

তখন তোমার হাসি পায়?'

'যদি দেখি জিতছি।' আলো লেগে রানার দাঁত ঝিক্ করে উঠল।

'নাহ্, বিশ্বাস করলাম না! আমার ধারণা, হারার সময়ও হাসবে তুমি। একেবারে শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলার আগে পর্যন্ত।'

শ্রাগ করল রানা। 'কি জানি, খুব বেশি মজার হলে হাসতেও পারি। তবে বোধহয় অত জোরে নয়।'

'আসলে,' হঠাৎ উদাস ও দার্শনিক হয়ে উঠল লাজুলি, 'আনন্দময় জীবন আর প্রাণখোলা হাসি সবার জন্যে নয়, ভাগ্যবান অল্প কিছু মানুষের জন্যে। মানুষের জীবন, বেশিরভাগ মানুষের জীবন, একদমই ফাঁকা...বেঁচে থাকতে হয় তাই বেঁচে থাকে...'

'হ্যাঁ, একটা অভাব বোধ সবার মধ্যেই কাজ করে...'

রকিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লাজুলি। 'আমার মধ্যে নয়, রানা। আমি নিজের কোন অভাব রাখি না।' শরীর থেকে নাইটি খসে পড়ল। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন আহ্বান জানাচ্ছে দয়িতকে। 'আমার অভাব পূরণ করো। ঈশ্বরের কসম, এই মুহূর্তে আমার চোখে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ তুমি; আর মা মেরির কসম, বহু পুরুষকে বলতে শুনেছি সর্বকালের সেরা সুন্দরীদের একজন আমি। ভেবে দেখো, রানা, শুধু একবার ভাবো... আমাকে ফিরিয়ে দেয়া কি তোমার উচিত হবে? যখন স্বেচ্ছায়, কোনরকম দাবি ছাড়াই নিজেকে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে?'

'পরে আবার পস্তাবে না তো?'

'না।'

কামরার আলোটা নিভিয়ে দিল রানা। এগিয়ে এসে ধরা দিল লাজুলির আলিঙ্গনে। আর কোনও কথা হলো না ওদের।

ছয়

কোথাও একটা ডোরবেল বাজছে। ঘুম পুরোপুরি ভাঙেনি, বালিশের তলায় হাত চলে যাচ্ছে। পিস্তলের শক্ত ধাতব স্পর্শ পেল রানা, ইতিমধ্যে উঠে বসেছে বিছানায়। পা ঝুলিয়ে কার্পেটে নামল, দ্রুত চেক করল অস্ত্রটা, জানালার সামনে হেঁটে এসে ওয়ান-ওয়ে গ্লাসের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল।

বেল বাজাচ্ছে ওয়াসিম মালিকের বডিগার্ড নাদুসনুদুস শোকরান। চেহারায় সেই মার্কামারা বোকা বোকা ও অর্থহীন হাসি, কিছুক্ষণ পর পর কলিংবেলের বোতামে চাপ দিচ্ছে–ভাবটা এমন কেউ দরজা খুলুক বা না খুলুক সে তার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাবে।

ফিরে এসে খাটের কিনারায় বসে লাজুলির গায়ে মৃদু ধাক্কা দিল রানা। সবুজ চোখ মেলে তাকাল সে, দৃষ্টি অলস; তারপরই রানাকে চিনতে পেরে হাসল। 'এখনও বাঘ,' ঘুম জড়ানো গলায় বলল সে। 'সারাক্ষণ যুদ্ধে মত্ত।' গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করল। 'যেই আসুক, যতই বেল বাজাক, কোন লাভ হবে না।' রানাকে নিজের দিকে টানছে। 'আমরা সারাজীবন প্রেম করব, স্টার্ট ফ্রম নাউ।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'বাইরের লোকটা শোকরান। তোমার দেখা দরকার কি চায় সে।'

চোখ বিস্ফারিত, শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল লাজুলির। 'না,

প্লীজ। ওই মোটা লোকটাকে দেখলে গা শিরশির করে আমার। আমি ওর সামনে যেতে চাই না।'

'কিন্তু যাওয়া দরকার,' নরম সুরে বলল রানা। 'কাল তোমার সঙ্গে তৃষার দেখা হচ্ছে, এটা ওরা জানে। এ-ও জানে যে তৃষাকে মানা করার কোন উপায় নেই আমাদের। কাজেই যত বেশি সম্ভব তথ্য পেতে হবে আমাকে।' ঝুঁকে লাজুলির ঠোঁটে আলতো করে চুমো খেলো একটা। 'ভয়ের কিছু নেই, পিছন দিকের দরজার কাছেই থাকব আমি। যদি দেখি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইছে, গুলি করে ওর ফুটবলটা ফাটিয়ে দেব।'

আর কিছু না বলে কিমানোটা পরল লাজুলি, দরজা খুলতে যাচ্ছে। দ্রুত পিছিয়ে এসে লিভিং রূম থেকে বেরিয়ে গেল রানা, হাতে ওয়ালথার। এই সময় খেয়াল হলো ওর পরনে কিছু নেই। ইতিমধ্যে কামরার সামনের দরজা খুলে ফেলেছে লাজুলি, কাজেই বিছানা থেকে কাপড় নিয়ে আসার কোন সুযোগও নেই ওর।

'হ্যালো,' পিছনের দরজার পাশ থেকে লাজুলিকে বলতে শুনল ও। 'ও, তুমি, শোকরান। এই অসময়ে বেল বাজিয়েছ, কাজেই তোমার শাস্তি হওয়া উচিত...উচিত...উচিত গরমাগরম এক কাপ কফি।'

'হে-হে!' হাসল শোকরান। 'মাদাম লাজুলি, সালাম। আজ সকালটা না খুব সুন্দর। বসন্তকালটা আসলে আপনার প্রতি খুব সদয়। হে-হে।'

ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে, সেজন্যে খুশি রানা। কিন্তু খোলা বার্জে বিবস্ত্র অবস্থায় হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব অস্বস্তিবোধ করছে ও। ভোরবেলা নদীর ধারে লোকজন নিশ্চয়ই বেড়াতে আসে, দেখে ফেললে ডাকাত মনে করে না চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

'শোকরান, আমাকে অভদ্র ভেবো না। তবে সত্যি বলছি, কাল রাতে এক লোক আমাকে জাদু করেছিল, ফলে ঘুমাতে যেতে

অনেক দেরি করে ফেলি। তুমি যদি কিছু বলতে চাও তো বলো, আমি এখুনি আবার এক হপ্তার জন্যে ঘুমাতে যাব।'

'আপনে বহোত মজাদার লেড়কি,' বলল শোকরান, তারপর ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে ভাষান্তর করল, 'ইউ আর ভেরি ফানি গার্ল, মাদাম। আমার হুজুরের জানার সুযোগ হয়নি কাল রাতে আপনি কোথায় ছিলেন। তো হুজুর আপনার কথা ভেবে বহোত চিন্তা করল।'

'তোমার হুজুরকে গিয়ে বলো আমাকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আরও বলবে, আমাকে সে যেন তার কোন সাবজেক্ট বলে মনে না করে। বলবে, এসপিওনাজ সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'কিন্তু হুজুর বলেছেন শ্যাতোয় গিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনাকে মোলাকাত করতে হবে।'

'তুমি বোকা নাকি, শোকরান?' হাসছে লাজুলি। 'এই না বললাম, পুরো এক হপ্তা ঘুমাতে হবে আমাকে!'

'আমার হুজুর না শুনতে পছন্দ করেন না, মাদাম,' বলল শোকরান, বোকা বোকা হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। 'আপনি তো জানেনই হুজুর আমার কেমন রাগী।'

'গিয়ে বলো লাজুলির রাগ তার চেয়েও বেশি। এখনও হাসছে লাজুলি। 'দেখা যদি হয়, আমি চাইলে হবে। কেউ ডাকলেই আমি যাই না। তবে তুমি যখন আবার কোন কাজে এদিকে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না।'

'আমার হুজুর বললেন—শোকরান, মাদাম লাজুলিকে গিয়ে বলো সে যদি আজ রাতে আমার শ্যাতোয় ডিনার খেতে আসে তাহলে পাক-ভারত যুদ্ধ-পরিকল্পনা নিয়ে একটা সাংঘাতিক এক্সক্লুসিভ নিউজ পেতে পারে—অন্য কোন রিপোর্টারকে কিছু বলাই হবে না। খুব বড় খবর, মাদাম।'

'বড় খবর?' অকস্মাৎ আঁতকে উঠল লাজুলি। 'সর্বনাশ,

আমার কফির পানি কখন থেকে ফুটছে! দাঁড়াও, এখুনি আসছি।'

পিছনের দরজা দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে এলো লাজুলি, ভুরু উঁচু করে ইঙ্গিতে জানতে চাইল প্রশ্নটা ও বুঝেছে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক জবাব দিল রানা।

লিভিংরুমে ফিরে এসে শোকরানকে বলল লাজুলি, 'কিছু মনে কোরো না, শোকরান। ঠিক আছে, মালিককে গিয়ে বলো আমি যাব। তবে এ-ও বলতে ভুলবে না যে তাঁর আচরণে আমি খুশি হতে পারিনি। এই বড় খবরটা যদি সত্যি বড় না হয়, আমাকে বোকা বানিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার ফন্দি হয়, মালিকের সমস্ত কেলেংকারি আমি সবগুলো কাগজে ছেপে দেব।'

'হুজুর বলেছেন, খবরটা সত্যি বড়,' বলল শোকরান। এবার তার বিদায় নেয়া উচিত। কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণ নেই। রানা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

'শোকরান, ভাই আমার,' লাজুলিকে বলতে শুনল ও, 'যেভাবে হাঁ করে তাকিয়ে আছ ওভাবে তাকিয়ে না থাকলে আমার মস্ত একটা উপকার করা হবে। আরও বড় উপকার করা হবে ফিরে গিয়ে মালিককে যদি বলো সন্ধ্যা আটটার দিকে যেন ককটেল ঠাণ্ডা রাখা হয়।'

শোকরানের খক্-খক্ হাসি কামরার ভেতরটা ভরাট করে তুলল। দুর্বোধ্য কয়েকটা শব্দ করল সে, যেন বিদায় নিচ্ছে। রানা অপেক্ষা করছে লাজুলি ফিরে এসে জানাবে আপদ দূর হয়েছে। তবে এ-ও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে শোকরান যখন চলে যাচ্ছে তার কানে ফিসফিস করে লাজুলি কিছু বলছে না। অবশ্য মেয়েটিকে ইতিমধ্যে যতটুকু চিনেছে ও, বিশ্বাস করা কঠিন যে আইএসআই-এর হয়ে কাজ করছে সে।

রানার চিন্তায় বাধা দিল পিছন থেকে ভেসে আসা কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর। বন করে ঘুরল ও, হাতের পিস্তল লুকাবার চেষ্টা করছে। লোকটা প্রায় বুড়ো, পাশের বার্জ থেকে রানাকে 'হ্যালো'

বলছে। তার চোখ টকটকে লাল, পা টলছে, আধ খালি বোতল থেকে আরও দু'ঢোক সস্তা আলজিরিয়ান ওয়াইন ঢালল গলায়। 'বলছিলাম কি, শিশু, একটা সিগারেট হবে নাকি?'

হেসে ফেলল রানা। 'শিশুর কাছে সিগারেট?'

'বেশ তো, বেশ তো, এই সামান্য একটা ভুল নিয়ে পাড়া মাথায় তোলার কি দরকার! হাতে অত বড় পিস্তল কেন, কাউকে খুন করবে বুঝি? সে কি তোমার প্রেমিকা? একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না—তোমার বয়সে আমি কিন্তু কখনোই ইস্পাতের পিস্তল ব্যবহার করিনি। ওই যে, ঈশ্বর তোমাকে চামড়ার যে ফাসক্লাস পিস্তলটা দিয়েছেন...'

চট করে পিছন ফিরে চামড়ার পিস্তলটা খচ্চর বুড়োর চোখের আড়াল করল রানা। 'কোনটা ব্যবহার করব, সিদ্ধান্ত নেয়ার পর জানাব আপনাকে,' বুড়োকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আপনি যাতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন।'

এই সময় দরজায় উদয় হলো লাজুলি।

'উনি কে?' বুড়োর দিকে বুড়ো আঙুল তুলল রানা।

উঁকি দিয়ে পাশের বার্জে তাকাল লাজুলি। 'সুপ্রভাত, বার্নি। কেমন যাচ্ছে দিনটা?'

'প্রায় গতকালের মতই খারাপ, তবে যে-কোন বিচারে আগামী কালের চেয়ে ভাল, প্রিয়তমা,' হাত নেড়ে জবাব দিল বুড়ো।

রানাকে টেনে ভেতরে ঢোকাল লাজুলি। 'ও হলো বার্নি। কুঁড়ের বাদশা একটা, অকম্মার ধাড়ি। প্রতিবেশীদের জন্যে উপদ্রব মনে করে পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, ও আমার কাজের লোক বলে তাদেরকে বিদায় করি। লোকটা সত্যি কোন কাজ করে না। ভাগ্যিস হারাবার মত কোন সুনাম নেই আমার, তা না হলে বিপদেই পড়তাম। বার্নিকে নিয়ে গুজবের কোন অন্ত নেই। তবে বুড়ো সত্যি খুব পছন্দ করে আমাকে। এ-সব কথা থাক,'

থেমে রানার গলা জড়াল দু'হাতে, প্রায় ঝুলে পড়তে চাইছে। 'আমাকে একটু আদর করো, রানা। বলে দাও ওয়াসিম মালিকের শ্যাতোয় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে।'

খুব সহজ কয়েকটা নির্দেশ দিল রানা। সময়মত মালিকের সঙ্গে দেখা করবে সে, ভাব দেখাবে আগের মতই সহযোগিতা করতে আগ্রহী, তারপর রানার কাছে ফিরে এসে জানাবে তৃষাকে ধরার জন্যে আইএসআই ঠিক কি ধরনের অপারেশনে যেতে চাইছে।

লাজুলি একটু অবাক হয়েই জানতে চাইল, 'কাল রাতে কাফেতে আসার আগে তৃষা চৌধুরীকে খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই তোমাদের? তাহলে কি ধরনের নেটওঅর্ক চালাচ্ছ তোমরা?'

'প্যারিসে আমাদের অন্তত দুশো এজেন্ট খুঁজছে তাকে,' বলল রানা। 'সমস্যা হচ্ছে ছবি না থাকায়। একটাই ছবি পেয়েছি আমরা, তাতে তাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে, তাও মুখটা অস্পষ্ট। অথচ আইএসআই-এর কাছে ডজন ডজন ছবি আছে ওর।'

'ভুল আমিও একটা করেছি,' বলল লাজুলি। 'সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় ছবি তুলিনি। আসলে সেই মুহূর্তে ক্যামেরাটা কাজ করছিল না...,' হঠাৎ থেমে রানার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল সে। 'ভাল কথা, অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে, শুনবে? আমি যেদিন তৃষার সাক্ষাৎকার নিলাম তার পরদিন ভারতীয় দূতাবাসের কমার্স সেক্রেটারি মসিয়ো ঘুঙ্গুরনাথ ঠনঠনিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে তৃষার একটা ছবি দিতে পারব কিনা জানতে চাইছিলেন। কথায় কথায় বললেন, ওর ভাল একটা ফটোগ্রাফের বিনিময়ে তিনি দামী একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করতেও প্রস্তুত আছেন।'

'হুম।' রানা গম্ভীর। 'তুমি কি বললে?'

‘তোমাকে যা বলছি—সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় ক্যামেরাটা কাজ করছিল না।’

মনে মনে প্রশ্ন করল রানা, কথাটা কি সত্যি? সাপ ও ব্যাঙ, দুটোর ঠোঁটেই চুমো খাচ্ছে না তো লাজুলি?

‘মালিকের ফাঁদে তৃষা ধরা পড়েছে, এটা দেখতে আমার ভাল লাগবে না,’ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল লাজুলি। ‘তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে, রানা…’

‘দেখা যাক।’

‘মালিককে কাঁচকলা দেখিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে ঠিক এভাবে সরে আসবে তুমি,’ আঙুল দিয়ে তুড়ি মেরে দেখাল লাজুলি। ‘তবেই না আমার হিরোকে নিয়ে আমি র্ব করতে পারব।’

‘সে দেখা যাবে,’ বলল রানা। ‘এখন আমি শাওয়ারের নিচে যাচ্ছি…’

‘ভেরি গুড,’ চেঁচিয়ে উঠল লাজুলি। ‘চলো পরিচ্ছন্ন হতে সাহায্য করি তোমাকে। আমি একবার একটা জাপানি হোস্টেস-এর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম…’

‘না। তোমার অন্য কাজ আছে। বার্নিকে একটু ঘুরেফিরে দেখতে বলো আশপাশে সন্দেহজনক কেউ ঘুরঘুর করছে কিনা।’ বাথরূমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, ভাবল সাবধানের মার নেই।

দশ মিনিট পর লাজুলির চিৎকার শুনতে পেল রানা, ‘বার্নি বলল, কোথাও একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।’ বাথরূম থেকে বেরুতেই ওকে টেবিলে টেনে এনে ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে বসাল লাজুলি। টেবিলে প্রায় কোন কথাই হলো না। লাজুলি বুঝতে পারল, যে-কোন কারণেই হোক রানার মূড বদলে গেছে।

মালিকের শ্যাতো থেকে বেরিয়ে রানার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে, লাজুলিকে বুঝিয়ে দিল রানা, আরও এক কাপ কফি খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো জাগুয়ারের কাছে।

কাপড়চোপড় বদলাবার জন্যে হোটেলে একবার ফিরতে হলো রানাকে। স্যুইটটা অত্যন্ত সাবধানে সার্চ করা হয়েছে দেখে মোটেও আশ্চর্য হলো না। তবে গুরুত্বপূর্ণ যে-সব জিনিস লুকিয়ে রেখেছে, সেগুলোর খোঁজ পায়নি তারা।

রফিককে ফোন করে কাল রাতের মারাত্মক ঘটনাটার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আরও সাবধান হবার নির্দেশ দিল রানা, তারপর নির্দিষ্ট একটা কাজ করতে দিল। কাজটা করার পর কোথায় দেখা করতে হবে তাও বলে দিল।

হোটেল থেকে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার সেফ হাউসে চলে এলো রানা। টেলি-কনফারেন্সের আয়োজন করতে বিশ মিনিট সময় দিতে হলো এঞ্জিনিয়ারদের। এক সময় মনিটরে প্রস্ফুটিত হলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, বললেন, 'প্রতি মুহূর্তে জটিলতা বাড়ছে, রানা। পাকিস্তানের চাপা গর্জন শুনতে পাচ্ছি আমি। ওদিকে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সও শান দিচ্ছে ছুরিতে। এমন হতে পারে প্যারিস থেকে সরিয়ে এনে তোমাকে হয়তো প্রফেসর চৌধুরীকে উদ্ধার করতে পাঠাব আমি। মেয়েটাকে পাগলের মত খুঁজছে আইএসআই। তাকে যদি ওরা পায়, আমি নিশ্চিত প্রফেসর চৌধুরী পাকিস্তান থেকে আর বেরুবেন না। এবার তুমি বলো।'

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে বলল রানা।

শুনে রাহাত খান বললেন, 'এই মেয়েটা, লাজুলি, যদি ডাবল এজেন্ট হয় তাহলে তো তোমার ঝামেলা শতগুণ বেড়ে যাবে...'

'কিছু করার নেই, স্যার,' বলল রানা। 'শুধু সন্দেহ করে ওকে এড়িয়ে থাকা বা চুপ করিয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। সে এরই মধ্যে অনেক কাজে এসেছে।'

'তোমার কি জানা আছে, রানা, পাকিস্তানে লাজুলির বাবার ব্যবসা আছে–সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ইস্পাত মিল, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি–সব মিলিয়ে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

করেছেন ভদ্রলোক?'

'ব্ল্যাকমেইল? অসম্ভব নয়, স্যার।' নিজের প্ল্যান সম্পর্কে একটু আভাস দিল বসকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করলেন বিসিআই চীফ। 'বেশ ভাল প্ল্যান। আরেকটা কথা, রানা। তৃষাকে পেলে ওর আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে নিয়ো। ওটা ওকে ওর মা দিয়েছিলেন। ওটা দেখলে প্রফেসর চৌধুরী বিশ্বাস করবেন যে তাঁর মেয়ে সুস্থ ও নিরাপদ আছে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'বুঝেছি,' বলল রানা। 'কি ঘটল রিপোর্ট করব, সার।'

তোবড়ানো, রঙচটা একটা ভ্যানগাড়ি। গায়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা–'সিমোন ফীড ভ্যান: পশু খাদ্য সরবরাহকারী'। ড্রাইভার আর তার সহকারীর পরনে কোম্পানির নোংরা ইউনিফর্ম। দশ-পনেরো মাইল পর পর ভ্যানগাড়ি থামিয়ে বার-এ ঢুকছে তারা, প্রতিবার এক-আধ পেগ করে সস্তা দামের মদ গিলছে। শহর পিছনে ফেলে এলো গাড়ি, ধু-ধু প্রান্তর ধরে আরও বিশ মাইল এগোল। সন্ধ্যার ঠিক আগে আবার থেমে একটা বার-এ ঢুকল দু'জন, অপেক্ষা করল সূর্যটা যতক্ষণ না গাছপালার আড়ালে হারিয়ে না যায়। পরনে নোংরা ইউনিফর্ম, বিশেষভাবে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না, বিদেশী শ্রমিক ভেবে এড়িয়ে থাকছে। বার থেকে বেরিয়ে এবার তারা মেইন রোড ছেড়ে একটা প্রাইভেট রোডে ঢুকল। মাইল দুয়েক আসার পর ড্রাইভার রফিক ভ্যান থামিয়ে পকেট থেকে ভাঁজ করা দুটো কাগজ বের করল–একটা গোটা এলাকার সার্ভে ম্যাপ, অপরটা ওয়াসিম মালিকের বাবার কেনা শ্যাতোর লে-আউট।

ম্যাপের ওপর চোখ বুলিয়ে লে-আউটটা আরেকবার দেখল রানা। ইঙ্গিতে মেটো পথটা দেখাল রফিককে, পথটা একটা সবুজ জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। 'ওদিকে কাঠের একটা গেট আছে। তার

আগে ফাঁকা একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। আমার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে তুমি, গেটের দিকে পিছন ফিরে।'

মেটো পথটাকে পাশ কাটিয়ে আগের রাস্তা ধরে আবার ছুটল ভ্যান, ক্যাব-এর মেঝেতে বসে পড়ায় বাইরে থেকে রানাকে কেউ দেখতে পাবে না। মেইন গেটে একবার গাড়ি থামাল রফিক, গার্ডকে জিজ্ঞেস করল আস্তাবলে যাবার ভাল রাস্তা কোনটা। আসলে গাড়ি থামিয়ে গার্ডকে ভাল করে দেখতে দেয়া হলো যে ক্যাবে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই, কারণ ভ্যান নিয়ে বেরুবার সময় ক্যাবে একাই থাকবে রফিক।

গেট পিছিয়ে পড়তে সিটে উঠে বসল রানা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে আস্তাবলের দিকে যাচ্ছে ওরা, দু'পাশে কোথাও বাগান, কোথাও সবুজ লন। সদ্য রঙ করা আস্তাবলের সামনে গাড়ি থামাল রফিক। ভ্যানের পিছনে চলে এসে ভারী বস্তা টেনে নামাচ্ছে ওরা। লেদার অ্যাপ্রন পরা এক লোক ধীর পায়ে হেঁটে এলো, হাতে একটা হর্সশুয়িং হ্যামার, ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওহে,' ঘর্মাক্ত কলেবর, ফ্রেঞ্চ-ভাষায় জিজ্ঞেস করল রফিক, 'ঘোড়ার খাবার দিয়ে যাচ্ছি, কাগজে সই করাব কাকে দিয়ে?'

অ্যাপ্রন পরা লোকটা মাথা চুলকাল। 'কই, আমি তো জানি না যে খাবারের অর্ডার দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এখন তো ট্রেইনারকেও পাওয়া যাবে না।'

'এটা স্পেশাল একটা মিকশ্চার। আজ রাতে খাওয়াবার জন্যে অর্ডার দেয়া হয়েছে।' রফিককে বিরক্ত দেখাল। 'সই করলে করো, তা না হলে মাল ফিরিয়ে নিয়ে যাই আমরা।'

লোকটা ইতস্তত করছে। 'বুঝতে পারছি না কি করব। মনিব তো অনেকক্ষণ হলো ঘোড়া ছুটিয়ে কোথাও গেলেন, কখন ফিরবেন কে জানে...'

ফ্রেঞ্চ লোকটাকে গাল দিল রফিক। 'মর ব্যাটা! তোর

মনিবকে বলিস আর যেন কখনও স্পেশাল মিকশ্চার না চায়...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে–কাগজ দাও, সই করে দিই,' বলল লোকটা।

ভুয়া একটা ইনভয়েসে সই করল সে। ক্যাবে চড়ে ভ্যান ছেড়ে দিল রফিক, ছুটে এসে তার পাশে উঠে বসল রানা। ফিরতি পথে এগোচ্ছে গাড়ি। 'সামনের বাঁকে বলব কোথায় আমাকে নামিয়ে দেবে। মেইন গেটে গার্ড যদি জিজ্ঞেস করে এত দেরি হলো কেন, বলবে পথ হারিয়ে ফেলেছিলে।'

গাড়ি এগোচ্ছে, রানার চোখ রিয়ার ভিউ মিররে স্থির হয়ে আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে আস্তাবলের সামনে ফিরে এলো ওয়াসিম মালিক, নিচে নেমে আস্তাবলের লোকটার সঙ্গে দু'একটা কথা বলল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল আরেক দিকে।

জঙ্গলে ঢুকে রানার নির্দেশে গাড়ি থামাল রফিক। ক্যাব থেকে নেমে ভ্যানের পিছন থেকে লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের পোলের মত একটা যন্ত্র নামাল রানা। বন্দুকের মত ডিভাইসটা বসানো হয়েছে ওয়ায়্যার শোল্ডার পীস-এ, ডিভাইসের সঙ্গে একটা পোর্টেবল পাওয়ার প্যাকও আছে। 'যাও,' ক্যাবের পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিল রানা। ভ্যান নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটল রফিক।

ট্রাক অদৃশ্য হবার দু'মিনিটের মাথায় সূর্য অস্ত গেল। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লনে উঁকি দিচ্ছে রানা, দেখল ঝকঝকে নতুন একটা সিঁত্রো দীর্ঘ গাড়িপথ ধরে তীরবেগে ছুটে আসছে। আপনমনে হাসল রানা। স্পীড দেখেই বোঝা যাচ্ছে, লাজুলি পৌঁছাল। বাপকে কি বলেছে কে জানে, তবে নতুন একটা গাড়ি ঠিকই আদায় করে নিয়েছে। পানি ভর্তি পরিখার ওপর পাথুরে ব্রিজে একবার থামল সিঁত্রো, তারপর আবার ছুটল।

এক গাছ থেকে আরেক গাছের আড়াল নিয়ে অনেকটা দূরত্ব পেরিয়ে আসতে হলো রানাকে, অবশেষে ওর বাছাই করা ওক গাছের নিচে এসে থামল। প্রথম শাখাটা ওর কাছ থেকে বিশ ফুট

ওপরে। এক প্রস্থ নাইলনের কর্ড ছুঁড়ল ও, শাখাটাকে আধ পাক জড়িয়ে প্রান্তটা নেমে এলো। ইকুইপমেন্টগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল ও, তারপর কর্ড ধরে উঠে এলো শাখাটায়। এক শাখা থেকে আরেক শাখায় উঠতেও কোন সমস্যা হলো না। চওড়া একটা ডালে বসে ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শ্যাতো থেকে দুশো গজ দূরে রয়েছে রানা। অ্যালুমিনিয়াম রডটা এক পাল্লার একটা জানালার দিকে তাক করে পাওয়ার প্যাকের কয়েকটা ডায়াল নাড়াচাড়া করল, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে নতুন প্যারাবলিক লং-রেঞ্জ মাইক্রোফোনের দিকে। এই মাইক্রোফোন প্লেট গ্লাস উইন্ডোর ভেতরের শব্দ ধরতে পারে। আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি প্লেব্যাক সিস্টেমটা একদম নতুন। ভুরুর কোঁচকানো ভাব থাকল না, মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। ডাইনিংরুমের জানালার দিকে তাক করা লিসনিং ডিভাইস এইমাত্র যে শব্দগুলো রেকর্ড করে রানাকে শোনাচ্ছে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল—একজন চাকরানী টেবিল সাজাচ্ছে, হঠাৎ এক চাকর তাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমো খেয়ে ফেলেছে। ডিভাইসটা অ্যাডজাস্ট করার সময় মেয়েটার অশ্রাব্য গালিগালাজ বাধ্য হয়ে শুনতে হলো ওকে।

এরপর ডিভাইসটা স্টাডিরুমের জানালায় তাক করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াসিম মালিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—অমায়িক, মার্জিত ও কোমল সুরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে লুসিন্ডা লাজুলিকে।

গাছের ডালে বসে এমন বহু লোকের টুকরো টুকরো গল্প শুনতে হলো রানাকে যাদের চেনে না ও। তারপর ডিনারে বসে ওয়াসিম মালিক তৃষা প্রসঙ্গে প্রথম কথা বলল। মালিক বা লাজুলি, দু'জনের কারুরই জানার কথা নয় যে ওদের প্রতিটি কথা মাইক্রোসাউন্ড টেপে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

'সেই যে মেয়েটা, যাকে নিয়ে একবার আমরা আলাপ করেছিলাম,' এভাবে শুরু করল মালিক। 'জানতে পারলাম তার

সঙ্গে আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তোমার।'

'তাহলে তো আমাকে ভাবতে হয়, তুমি জানো কি করে?' লাজুলি যেন খুব মজা পাচ্ছে।

'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে মেয়েটা পাকিস্তানী,' জবাব দিল মালিক। 'আর প্যারিসে পাকিস্তানীদের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে সব জানতে হয় আমাকে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর মেয়ে সে। ছেলেমানুষি অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ে নিজের ক্ষতি করে বসুক, এ আমরা হতে দিতে পারি না।'

'অ্যাডভেঞ্চার? কিন্তু আমি যতটুকু বুঝেছি, তৃষা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!'

হেসে উঠল মালিক। 'পাকিস্তানীদের বা আরও পরিষ্কার করে যদি বলি, মুসলমানদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুব কম জানো তুমি। ভদ্র মুসলিম পরিবারের কোন মেয়ে কোন অবস্থাতেই পরিবার ছেড়ে চলে যাবে না। মেয়েটার বয়স কম। সে বুঝতেই পারছে না যে পাকিস্তানের শত্রুরা তাকে পেলে মেরে ফেলবে। যাই হোক, আমার দায়িত্ব হলো তাকে...'

'ঠিক আছে, দেখা হলে তোমার এ-সব কথা তাকে আমি বলব,' লাজুলির গলা।

'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি। আরও একটু বলি, তোমার কাছ থেকে এই যে সহযোগিতা পাচ্ছি আমরা, এর বিনিময়ে তোমার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজদের যে উপদ্রব শুরু হয়েছে তা বন্ধ করার পাকা ব্যবস্থা করছি আমরা...'

লাজুলির জবাব, 'এই খবরটা বাবাকে জানালেই ভাল করবে। কারণ পারিবারিক ব্যবসা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা বা আগ্রহ নেই।'

'এর মধ্যে আরও ব্যাপার আছে,' বলল মালিক। 'আরও পাঁচ রকম ব্যবসা করার জন্যে অনুমতি চেয়েছ তোমরা। আমি সংকেত দিলেই পাকিস্তান সরকার ফাইলগুলো ছেড়ে দেবে।'

'তোমাকে তো বললামই, মালিক, পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।'

'এ-সবের বিনিময়ে আমি শুধু চাই তৃষার ঠিকানাটা পাওয়া মাত্র আমাকে জানাবে তুমি। আর যদি কোন কারণে ঠিকানা দিতে না পারো, তাকে দিয়ে তার বাবাকে একটা চিঠি লেখাবে–তাতে লিখবে, সে ভাল আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানে ফিরে আসতে চায়।'

'এরকম একটা চিঠি কেন দরকার তোমার?' জানতে চাইল লাজুলি।

'দরকার রাজনৈতিক কারণে,' দ্রুত জবাব দিল মালিক। 'পাকিস্তানের শত্রুরা যদি তৃষাকে কিডন্যাপ করতে সফল হয়, চিঠিটা তখন কাজে লাগবে। তৃষাকে তুমি বলবে, তার লেখা চিঠি বিদেশী রিপোর্টারদের মাধ্যমে প্রফেসর চৌধুরীর কাছে তুমি পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে।'

রানা একটা ঢোক গিলল। ওয়াসিম মালিক তৃষার আঙটির কথাটা জানে না। এত আয়োজন আর কষ্ট করে এখানে ওর আসাটা বিফলে যায়নি। লুসিন্ডা লাজুলির সততা প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও, জানা গেল আইএসআই-এর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে ও। কাল রাতে লা দোঁর্কা কাফেতে লাজুলির সঙ্গে দেখা করতে এলে মালিক নির্ঘাত তৃষাকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। তাতে যদি সে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রফেসর ফারুক চৌধুরীকে পাকিস্তান থেকে বের করে আনার বিসিআই-এর পরিকল্পনা সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। আঙটি না দেখে প্রফেসর চৌধুরী বিশ্বাসই করবেন না যে তাঁর মেয়ে পাকিস্তানীদের হাতে আছে। তখন বিসিআই এজেন্টের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে আপত্তি করবেন না। অর্থাৎ রানাকে এখন শুধু দেখতে হবে ইতিমধ্যে আইএসআই যাতে কোন ভাবেই মেয়েটাকে খুঁজে না পায়।

'কাল রাতে তুমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করবে,' বলে যাচ্ছে

মালিক, 'তোমার সঙ্গে আমিও থাকতে পারলে খুশি হতাম। তবে থাকব না, কারণ জানি বিদ্রোহী ছেলেমেয়েরা চিরকালই কর্তৃপক্ষকে অবিশ্বাস করে। তোমার চমৎকার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আমার আস্থা আছে, লাজুলি। পারলে তুমিই ওই বাচ্চা মেয়েটাকে নিজের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করতে পারবে।'

'বাচ্চা মেয়ে? হাহ্! আমি তো দেখেছি পূর্ণযৌবনা এক নারীকে। মনে নেই, আমি তার ইন্টারভিউ নিয়েছি? তবে সে কি বলে তোমাকে আমি জানাব।'

তিন ঘণ্টা পর মন্টপারনাসে স্ট্রীট-এ লাজুলির সঙ্গে দেখা হলো রানার। কাছাকাছি একটা ডিসকাটেক-এ ঢুকল ওরা, নাচ আর পপ মিউজিকের জন্যে বিখ্যাত। হৈ-হট্টগোল আর নাচানাচির মধ্যে কথা বলা সম্ভব হলো না, বাইরে বেরিয়ে এসে আলোচনা করছে কোথায় যাওয়া যায়।

'আমার উদ্দেশ্য তোমার সঙ্গে প্রেম করা,' বলল লাজুলি। 'আর তোমার উদ্দেশ্য আমাকে নিঙড়ে কথা বের করা। দুটো কাজের জন্যে আমার আস্তানাটাই আদর্শ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। মালিক বোকা নয়। তোমার ওই হাউসবোটের ওপর তার লোকেরা অবশ্যই নজর রাখছে।'

হঠাৎ হেসে উঠল লাজুলি। 'সমস্যাটা আসলে ছোট্ট। আমি এরইমধ্যে সমাধান পেয়ে গেছি।'

'বেশ, আমি দেখতে চাই সত্যি ওটা কোন সমাধান কিনা।'

একটা ট্যাক্সি ডাকল লাজুলি। সেইন নদীর কিনারা ধরে ছুটল গাড়ি। লাজুলির প্রতিবেশীদের পাশ কাটিয়ে চলে এলো নদীর অপর পারে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে নদীর কিনারায় নামল লাজুলি, পাশে রানা। ফিসফিস করে ডাকল সে, 'বার্নি?'

'আমি এখানে, ম্যাডমোয়াজেল,' ছায়া থেকে ভেসে এলো কর্কশ ও পরিচিত কণ্ঠস্বর। একটা রো-বোটে বসে সারাক্ষণের

সঙ্গী আলজিরিয়ান ওয়াইনের বোতল খালি করছে বুড়ো।

চোখে-মুখে বিজয়িনীর উল্লাস নিয়ে রানার দিকে তাকাল লাজুলি। 'আমি কি সত্যি একটা দুর্দান্ত কাউন্টার-স্পাই নই?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বলল, 'তোমার অভিনয় প্রতিভারও তারিফ করি আমি।'

চুপচাপ বসে থাকল ওরা, বুড়ো মাতাল বৈঠা চালিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছে দিল। রো-বোট থামল হাউসবোটের পিছনের দরজায়, শুধু নদীতে কেউ থাকলে তার দৃষ্টি ওখানে পৌঁছাবে।

হাউসবোটের নিবিড় নিস্তব্ধতা যেন ঘনিষ্ঠ হবার একটা নেশা জাগিয়ে তুলল ওদের মধ্যে। বোধহয় মিনিট খানেক বা তারও বেশি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন। তারপর দুর্বল গলায় লাজুলি জানতে চাইল, 'তোমার কিছু চাই—ওয়াইন বা হুইস্কি?'

'প্রয়োজন বোধ করছি না,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

'আমিও না,' লাজুলির গলা আগের চেয়েও দুর্বল। 'তাহলে এসো...'

সাত

যদি জিজ্ঞেস করা হয় দিনের বেলা প্যারিসের কোথায় সবচেয়ে বেশি লোক সমাগম ঘটে, শহরের যে-কোন লোক নির্দ্বিধায় জবাব দেবে—লে হ্যালেস-এ। লে হ্যালেস হলো প্যারিসের মার্কেট ডিস্ট্রিক্ট। সুপারমার্কেট আর শপিংমলগুলো মাইলের পর মাইল

ছড়িয়ে আছে। রেস্তোরাঁ, বার ও কাফেগুলোতে উপচে পড়া ভিড়। ফুটপাতও দখল করে নিয়েছে হকাররা। এমনকি রাস্তাগুলোতেও চলমান দোকানের মিছিল দেখা যাবে, যার যা খুশি হাঁটতে হাঁটতেও কিনতে পারে। গোটা এলাকা মাঝরাতের দিকে ঝিমিয়ে পড়ে। রাত একটার দিকে একদম ফাঁকা হয়ে যায়, শুধু জনা কয়েক পুলিসকে দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন শুরু হবে বাঁধভাঙা বন্যার তোড়ের মত ট্রাক বহরের আগমন।

এই ট্রাক বহর আসে গোটা ফ্রান্স জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খেত, বাগান, কারখানা, মিল, রেলস্টেশন আর বন্দর থেকে দুনিয়ার মাল নিয়ে। ট্রাকের সঙ্গে আসে শ্রমিকরা, আশপাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসে বেশ্যারা, আর আসে থিয়েটার থেকে সদ্য বেরুনো লোকজন এবং দেশী-বিদেশী নিশাচর ট্যুরিস্টের দল। রাত তিনটের দিকে চাকা লাগানো কোন গাড়ি এই এলাকার রাস্তা ধরে আবাসিক এলাকায় পৌঁছতে পারবে না। গোটা রাস্তা জুড়ে চলছে লেনদেন, ট্রাক থেকে কিছু নামানো হচ্ছে বা ট্রাকে কিছু তোলা হচ্ছে।

কাফে লা বোঁবোঁ-র কাছাকাছি ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। রাত দুটো বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। রানা বসে আছে একটা ট্রাকের অন্ধকার ক্যাবে, নজর রাখছে তৃষা আর লাজুলির রদেভোঁ পয়েন্ট কাফে লা দোঁর্কা ও তার আশপাশে।

সময় হয়েছে, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রফিক। কাফে লা দোঁর্কার ভেতর রানা নিজে থাকতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু তা উচিত হবে না। আইএসআই এজেন্টরা বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে যতটা চেনে ততটা বোধহয় নিজেদের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকেও চেনে না, এমনকি ওর এই নীল স্মক পরা মার্কেট ওয়ার্কার-এর ছদ্মবেশও ধরা পড়ে যাবে মুহূর্তে।

তবে সব দিক বিবেচনা করে নিজের তৈরি প্ল্যানে রানা মোটামুটি সন্তুষ্ট। লাজুলি যদি স্পেশাল পারফিউম অ্যাটমাইজার

ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে, রানা নিশ্চিত সকালের মধ্যে ওর হাতে চলে আসবে প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর মেয়ে তৃষা চৌধুরী। মানে, যদি আদৌ সে আসে আর কি। এই বিশেষ পারফিউমটা সোহেলের কাছ থেকে পেয়েছে রানা। সোহেল আনিয়েছে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে।

রানা দেখতে পাচ্ছে নিজের কাভার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ক্যামেরার শাটারে ঘন ঘন চাপ দিচ্ছে লাজুলি। 'মধ্যরাতের পর মার্কেট ডিস্ট্রিক্ট' শিরোনামে একটা প্রতিবেদন তৈরি করার ভান। ট্রাক ড্রাইভার ও হেলপার, বাজারের দোকানদার ও কর্মচারী, দেশী ও বিদেশী ট্যুরিস্ট, খদ্দের ও বেশ্যা, সবার সঙ্গেই কথা বলছে সে। সেই সঙ্গে আসল কাজটাও করছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাঙালী একটা মেয়েকে—এই কদিনে যে মেয়ের টাকা, আত্মবিশ্বাস ও শারীরিক শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসার কথা। অবশ্য তৃষার এখনও আসার সময় হয়নি। তার আসার কথা তিনটের দিকে।

রাত ঠিক দুটো দশে সাইরেনের শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো তিনটে পুলিস কার। কাফে লা দোঁর্কার সামনে থামল ওগুলো। প্রথম কার থেকে নামল রফিক, তার হাবভাব দেখে মনে হলো ইউনিফর্ম পরা ও সশস্ত্র ফ্রেঞ্চ পুলিসের এই দলটাকে সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে। চারদিকে কয়েকশো কর্মব্যস্ত মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। কাফেটাকে প্রথমে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল পুলিস। তারপর রফিকের নেতৃত্বে পাঁচজন ভেতরে ঢুকল।

ট্রাক থেকে নেমে ওদিকে একটু এগোচ্ছে রানা। এই মুহূর্তে সবাই এত বেশি হতচকিত, ওর মাথায় চারটে শিং গজালেও কারও চোখে পড়বে না। রফিকের হুঙ্কার শুনে কোন রকমে হাসি চাপল রানা। এমন ফ্রেঞ্চ বলছে, এ যেন তার মাতৃভাষা। কি বলল সেটা আবার বাংলায় তরজমাও করল।

'আমি বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন অফিসার। পুলিসের সাহায্য নিয়ে আমরা একজন বাঙালী তরুণীকে গ্রেফতার করতে এসেছি। সে পুরুষের ছদ্মবেশেও থাকতে পারে। কাজেই যে যেখানে আছেন, কেউ নড়বেন না। আমরা সার্চ শুরু করছি।'

কাফের খোলা দরজার সামনে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছে, সেই ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে সালোয়ার কামিজ পরা ও গলায় ওড়না জড়ানো এক বাঙালী মেয়েকে দেখতে পেল রানা। হঠাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, দরজার দিকে ছুটে আসছে। এক পুলিস খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল। পটকা ফাটার মত শব্দ হলো, পরমুহূর্তে গুঙিয়ে ওঠার আওয়াজ–মেয়েটা পুলিসের গালে চড় তো মারলই, রফিককে এগিয়ে আসতে দেখে তাকেও কষে এক লাথি ঝাড়ল। তবে আরও দু'জন পুলিস এসে কাফে থেকে মেয়েটার বেরুবার পথ বন্ধ করে দিল। ভেতরে আরও পুলিস ঢুকছে দেখে হিংস্র বাঘিনীর মত ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল মেয়েটা। চিৎকার করে বলছে, এরা পুলিস নয়, ছদ্মবেশী গুণ্ডা, তাকে রাজনৈতিক কারণে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে–অথচ মসিয়োরা কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন না!

প্রায় টেনে-হিঁচড়েই পুলিস কারে তোলা হলো মেয়েটাকে। এক ফ্রেঞ্চ ইন্সপেক্টর কার-এ ওঠার আগে উপস্থিত নাগরিকদের উদ্দেশে একটা ব্যাখ্যা দেয়ার অনুরোধ করল রফিককে। রফিক বলল, 'আপনাদের অসুবিধে করার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। মেয়েটির অভিযোগ সত্যি নয়। তাকে আমাদের দেশের পুলিস গত কয়েক মাস ধরে তার প্রেমিককে হত্যার অভিযোগে খুঁজছে। সে যে হিংস্র প্রকৃতির মেয়ে, তার পক্ষে খুন-খারাবি সম্ভব, এ তো আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন। আপনাদের শান্তি নষ্ট ও কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্যে আরেকবার আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ।'

রফিকের খোঁড়ানোটা অভিনয় নয়, ওই দস্যি মেয়ের জুতোর

ডগা আরেকটু হলে হাঁটুর ওপর মাংসে গেঁথে যেত।

রানার চঞ্চল দৃষ্টি কাফের ভেতর ফিরে গেল। মাথায় পাগড়ি পরা এক শিখ কাফের বুদে ঢুকে টেলিফোনে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রানা প্রায় নিশ্চিত, লোকটা ছদ্মবেশী আইএসআই, অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ওয়াসিম মালিককে রিপোর্ট করছে।

নিজের ট্রাকে ফিরে এলো রানা। ও জানে আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা মার্কেট এলাকায় কারও আর জানতে বাকি থাকবে না যে নাটকীয়ভাবে হানা দিয়ে কাফে লা দোঁর্কা থেকে ফ্রেঞ্চ পুলিস এক বাঙালী মেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, মেয়েটিকে চিহ্নিত করার জন্যে পুলিসের সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন অফিসারও এসেছিল। খবরটা শুনে আইএসআই এজেন্টরা নিজেদের গাধা বলে গাল দেবে আর মাথার চুল ছিঁড়বে। তৃষা চৌধুরী এখন বিসিআই-এর হাতে, এটা ধরে নিয়ে অন্তত এই এলাকার ওপর তারা আর নজর রাখবে বলে মনে হয় না।

তবে এসপিওনাজ জগতে কেউ কারও চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয়। গোটা ব্যাপারটা যে সাজানো, ওয়াসিম মালিকের মাথায় এই সন্দেহ জাগতেও পারে। হয়তো এলাকার সব এজেন্টকে সে ডেকে নেবে না।

পরবর্তী প্রায় এক ঘণ্টা ধৈর্যের সঙ্গে ট্রাকে বসে থাকল রানা। মেয়েটাকে পেলে তার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দেবে লাজুলি, তাতে নির্দেশ থাকবে তৃষা যেন কাফে থেকে বেরিয়ে ট্রাকটায় এসে ওঠে। নির্দেশ মত কাজ করলে ভাল। আর যদি না করে, তাকে অনুসরণ করার অন্য এক ব্যবস্থা করে রেখেছে রানা।

তৃষা চৌধুরী টেরও পাবে না, রানার কাছ থেকে পাওয়া পারফিউম অ্যাটমাইজার তার কাপড়ে স্প্রে করবে লাজুলি। ওই পারফিউম রেডিওঅ্যাকটিভ, তবে এত কম মাত্রায় যে ক্ষতিকর নয়। ওই রেডিওঅ্যাকটিভ উপাদান এলাকার যে-কোন গাইগা

কাউন্টারে ধরা পড়বে। রোলেক্সের ওপর চোখ বুলিয়ে রানা দেখল তিনটের বেশি বাজে। এত ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়ার পরও মেয়েটি যদি না আসে তাহলে দুঃখ আর ভোগান্তির সীমা থাকবে না।

লোকজনের ভিড়ে অন্যরকম একটা আলোড়ন ধরা পড়ল রানার চোখে। রাস্তার আরও দূরে তাকাতে কারণটা বোঝা গেল। বিরাট একটা সাদা রোলস-রয়েস ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে কাফে লা দোঁর্কার দিকেই। কাফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে গাড়ি, এই সময় ওটার ফেন্ডার বুনো, একগুঁয়ে চেহারার এক লোককে সামান্য একটু ঘষা দিল। লোকটার গায়ের সাদা স্মকে তাজা ও শুকনো রক্তের প্রচুর দাগ ও ছিটা লেগে রয়েছে। সে একজন কসাই, কাজ সেরে সঙ্গীদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সবকটার চেহারাই বুনো আর একগুঁয়ে, তাছাড়া এমনিতেও দামী একটা গাড়ির ঘষা খেয়ে চুপ করে থাকার লোক তারা নয়। একটা রোলস-রয়েস কেনার পয়সা তারা কোনদিনই রোজগার করতে পারবে না, কিন্তু তাই বলে তারা কি এতই নগণ্য যে ওরকম একটা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে প্রাণ হারাতে হবে? ঘষা আর ধাক্কা, দুটোর সঙ্গে পার্থক্য কতটুকুই বা? ধাক্কা খাওয়া আর চাকার তলায় পিষ্ট হবার মধ্যেই বা কি এমন তফাত? রোলস-রয়েসের বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে এ-সব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কসাইরা কেউ কেউ এমনকি শার্টের আস্তিন পর্যন্ত গুটিয়ে ফেলছে। রানা গোটা ব্যাপারটা সামান্য কৌতুকের সঙ্গেই লক্ষ করছিল, এই সময় হঠাৎ ওর গাইগা কাউন্টার জ্যান্ত হয়ে উঠল।

দ্রুত ভলিউম কমিয়ে কাঁটাটার ওপর চোখ রাখল রানা, দেখল সেটা প্রবলবেগে কাঁপছে। মুখ তুলে গোটা দৃশ্যটা এক পলকে দেখে নিল ও। মাথাটা এত দ্রুত কাজ করছে, ওর দৃষ্টিসীমার ভেতর প্রত্যেকে যেন যে-যার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল—মুভি ক্যামেরার একটা সিঙ্গেল ফ্রেম-এর মত। ছোট বড় এত ভিড় ও

জটলার মধ্যে, সারি সারি রেস্তোরাঁ ও কাফের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর মাঝখানে, কিংবা কোন দরজার অন্ধকার আড়ালে লুকিয়ে আছে মেয়েটা। তৃষা চৌধুরী। যাকে খুঁজে বের করতে এরইমধ্যে কিছু লোক মারা গেছে। প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে রানার হাতে, প্রয়োজন হলে কাভারিং ফায়ার করতে তৈরি।

সময় স্থির হয়ে গেছে যেন শুধু রানার জন্যে। বাকি সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। কসাইরা এখনও রোলস-রয়েসের শোফারকে লক্ষ্য করে গালমন্দ আর হুমকি দিচ্ছে। নীল অ্যাপ্রন পরা মার্কেটের তিনজন দারোয়ান বা পাহারাদার কাফে লা দোঁর্কার ভেতর গায়ে আলো-ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন বেশ্যার রূপ-সৌন্দর্যের ঘাটতির প্রসঙ্গ তুলে দর যতটা সম্ভব কমাবার চেষ্টা করছে। এক ভারতীয় ট্যুরিস্ট আর তার স্ত্রী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোথায় কি ঘটছে সব লক্ষ করছে, এবং সারাক্ষণ পরস্পরের গা ঘেঁষে থাকছে। এক কিশোর হকার জাতীয় দৈনিকের প্রভাত সংস্করণ নিয়ে এসে চিৎকার করে হেডিংগুলো পড়ছে।

ইতিমধ্যে গাইগা কাউন্টারের কাঁটা রানাকে জানিয়ে দিচ্ছে, মেয়েটা এখনও এলাকা ছেড়ে চলে যায়নি। রোলস-রয়েসের উপস্থিতি সন্দেহের চোখে দেখছে ও, কাজেই একটা চোখ রেখেছে ওটার ওপর। এরকম একটা নোংরা ও ব্যস্ত এলাকায় বড় বেশি বেমানান লাগছে ওটাকে।

এতক্ষণে রোলস-রয়েসের দরজা খুলল। বাইরে বেরুল ডিনার জ্যাকেট পরা দীর্ঘদেহী এক লোক, পিছু নিয়ে বেরুল ইভিনিং গাউন পরা এক তরুণী। পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে আনার জন্যে সশরীরে নিজেই চলে এসেছে ওয়াসিম মালিক। তার সঙ্গিনীটি ফরাসী সুন্দরী, সিনেমা জগতের নতুন এক নায়িকা। রানা ভাবল, এখানে ওয়াসিম মালিককে আমি চাই না। তার শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে পিস্তলের মাজল তাক করল ও।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুই বেশ্যার একজন ছায়ার ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ওর দিকে এক পা বাড়াল মালিক, আর যেই রানার আঙুল ট্রিগারে চেপে বসছে অমনি কসাইদের একজন দু'হাতে জড়িয়ে ধরে জানে বাঁচিয়ে দিল তাকে। কসাইকে ছাড়াবার জন্যে রীতিমত ধস্তাধস্তি শুরু করল মালিক, বলছে ক্ষতি হয়ে থাকলে টাকা দেবে। ক্ষতি তো কিছুই হয়নি, তবে হতে পারত, এই যুক্তি দেখিয়ে মোটা টাকা দাবি করছে কসাইরা। এদিকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই সার, মালিককে গুলি করার সরল একটা পথ রানার কপালে জুটছে না।

হাতে গাইগা কাউন্টার, ক্যাব থেকে নেমে এলো রানা। ছায়া থেকে ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে ভিড় জমা কাফের দরজাটাকে পাশ কাটাল। গাইগা কাউন্টার জানাল, ঠিক পথেই আছে ও। রানাও দেখেছে এই রাস্তা দিয়ে ছুটেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মেয়েটা।

বেচারির কপালটাই খারাপ, ছুটতে শুরু করে ভাবল রানা, তা না হলে কাফে থেকে বেরিয়ে সরাসরি ওয়াসিম মালিকের সামনেই পড়ে! এখন তৃষা ওর কাছেও ধরা দিতে চাইবে না, যে ভয় পেয়েছে।

রানা যতটা সম্ভব কম শব্দ করে ছুটছে। একবার মনে হলো পঞ্চাশ গজ সামনে মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছে। আর ঠিক তখনই বাঁধাকপির ভেজা একটা পাতায় পা পিছলে আছাড় খেলো ও, বাঁধাকপি ঠাসা বড় বড় ঝুড়ির পাহাড়সদৃশ একটা স্তূপকে সঙ্গে নিয়ে। একটা ঝুড়ি বিস্ফোরিত হলো, ওটাতেই লেগেছে বুলেট। রাস্তার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে বাঁধাকপি, মাথা সামান্য একটু উঁচু করে চারদিকে তাকাচ্ছে রানা।

রোলস-রয়েসের হুডে কনুই ঠেকিয়ে গুলি করছে ওয়াসিম মালিক। লক্ষ্যভেদে তার সাফল্য ভীতিকর, সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো রানার মাথার পাশে পড়ে থাকা আরেকটা ঝুড়ি বিস্ফোরিত হওয়ায়। রানা পাল্টা গুলি না করার সিদ্ধান্ত নিল,

কারণ রোলস-রয়েসকে ঘিরে এত লোক ভিড় করেছে যে কাকে লাগবে বলা কঠিন। ঝুড়িগুলোকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগিয়ে রাস্তা ধরে আবার ছুটল রানা। মেয়েটা যেদিকে গেছে সেইদিকে। এখন তার আর ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। তবে গাইগা কাউন্টার-এর কাঁটা এখনও কাঁপছে।

দু'পাশের গলিগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে রানা। গাইগা কাউন্টার বলছে, এখনও সামনের স্ট্রীটেই আছে তৃষা।

রানার পিছু নিয়ে শিকারী কুকুরের মত ছুটে আসবে আইএসআই এজেন্টরা, তবে আরও খানিক পর। বাঙালী মেয়েটিকে রফিক গ্রেফতার করায় এইটুকুই লাভ হয়েছে। পাকিস্তানী স্পাই ক্যাম্পে দিশেহারা ভাব ও বিশৃংখলা দেখা না দিলে ওয়াসিম মালিক নিজে ফিল্ডে নামত না। সে সাধারণ কোনও এজেন্ট নয়, পদমর্যাদার দিক থেকে প্রায় রাহাত খানের কাছাকাছি–নোংরা কাজ করতে গিয়ে গুলি খাবার বা গ্রেফতার হবার ঝুঁকি বাধ্য না হলে নিত না।

একটা হাফ ট্রাক পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, লাফ দিয়ে সেটার পিছনে উঠে পড়ল রানা। ট্রাকটা পাকা কলা নিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হাসল রানা–ভাগ্যিস কাঁচকলা নয়! ট্রাক ছুটছে, সেই সঙ্গে গাইগা কাউন্টারের কাঁটা কাঁপতে কাঁপতে উঠছে ওপর দিকে

একটা চৌরাস্তায় থামল হাফ ট্রাক। নিচে নেমে এদিক ওদিক কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল রানা। গাইগা কাউন্টার ইঙ্গিত দিচ্ছে চৌরাস্তার নির্জন দিকটার কোথাও আছে মেয়েটা। ওদিকে বেশ অনেকগুলো মাংসের দোকান দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই একটা ডেলিভারি প্যাসেজের মুখের দু'পাশে। রাস্তা পার হয়ে সেদিকেই ছুটল রানা।

প্যাসেজ বা গলিটা অন্ধকার। শেষ মাথায় পৌঁছে রানা শঙ্কিত বোধ করল–সামনে খাড়া পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে বড় আকারের একটা ডেলিভারি ডোর। চেষ্টা করেও একটা দরজা খোলা গেল

না, তালা দেয়া। একটা দরজার নিচে আলো দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা ওর পিছন দিকে, আবার অনেকটা দূরেও।

গলির মুখে একটা শক্তিশালী টর্চ জ্বলল। আলোটা এগিয়ে এসে স্থির হলো রানার পা থেকে দু'ফুট দূরে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাথর হয়ে থাকল রানা। কাঁপা কাঁপা ভঙ্গিতে সরে গেল আলোটা, তারপর দেখা গেল আবার ফিরে আসছে। একটা ইঁট বা লাঠি পর্যন্ত নেই আশপাশে, কোথায় আড়াল নেবে রানা? মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে গুলি করে নিভিয়ে দিল আলোটা। কোন চিৎকার বা কাতর গোঙানির আওয়াজ হয়নি। যার হাতে টর্চ ছিল সে এখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে গাঢ় একটা ছায়া। নেহাতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে লোকটা, প্রাণ না হারিয়ে শুধু টর্চ হারিয়েছে। রানাও আর গুলি করছে না। ফরাসী পুলিস বা মার্কেটের কোন গার্ডকে আহত বা খুন করার কোন ইচ্ছে ওর নেই।

'উ সালে বঙ্গালী স্পাই,' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'ইধার আকে ঘুসা...' সে আসলে তার জিভ দিয়ে নিজের ডেথ ওয়ারেন্ট সই করল। রানার বুলেট তিন কদম পিছু হঠাল তাকে, একটা সজি ভর্তি ঠেলাগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঢলে পড়ল রাস্তার ওপর। রানা শুনতে পেল আরও খানিক দূর থেকে ভরাট গলায় নির্দেশ দিচ্ছে ওয়াসিম মালিক, 'আপনারা সবাই লোকটাকে ধাওয়া করুন, মসিয়ো! লোকটা এই মাত্র একটা কাফের ক্যাশ বাক্স ছিনিয়ে নেয়ার সময় একজন ওয়েটারকে গুলি করে মেরেছে। এলাকাটা তার অচেনা, পালাতে পারেনি, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।' সে জানে, এদিকের সমস্ত অপরাধ আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের ওঅরলর্ডরা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অনুমতি ছাড়া তুমি কাউকে খুন করলে তোমাকেও খুন হতে হবে। রানা অত্যন্ত ব্যস্ত, তা না হলে হেসে ফেলত। বাঁক নিয়ে গলিতে ঢুকতে যাবে একদল লোক, তাদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল ওর কয়েকটা

বুলেট। প্রথম দল পিঠটান দিল। মুশকিল হলো, রানার জানার উপায় নেই কে মার্কেট এলাকার লোক, কে আইএসআই স্পাই বা তাদের ভাড়াটে খুনী।

'শালার কাছে পিস্তল আছে, না?' একজনকে ফরাসী ভাষায় বলতে শুনল রানা। 'কোন চিন্তা নেই, মসিয়ো, ওকে বাঁশ দেয়ার ব্যবস্থা আমার কাছে আছে।'

তাই নাকি, মসিয়ো!

ত্রিশ সেকেন্ড পর এঞ্জিনের যান্ত্রিক গর্জন শুনে চমকে উঠল রানা। সর্বনাশ, ওরা কি ট্যাংক নিয়ে গলিতে ঢুকছে?

এক মুহূর্ত পরই উত্তরটা পাওয়া গেল। জোড়া হেডলাইট ঘুরল, সোজা ছুটে এলো গলি ধরে।

কোথায় পালাবে রানা? ট্যাংক নয়, তবে ট্যাংকের চেয়ে কম বিপজ্জনক নয় প্রকাণ্ড এক জোড়া ব্লেড সহ ফর্কলিফটটা। ব্লেড দুটো সরাসরি রানার দিকে তাক করেছে ড্রাইভার, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় শরীরে লাগা মাত্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে। পালাবার জায়গা যখন নেই, এখানে দাঁড়িয়েই মরতে হবে ওকে, তবে সিদ্ধান্ত নিল পুরুষ মানুষের মত লড়াই করেই মরবে, কাপুরুষের মত হাল ছেড়ে দিয়ে নয়। লক্ষ্যস্থির করার সময় নেই, ঝট করে হাত তুলে পরপর দুটো গুলি করল রানা। দুটো হেডলাইট নিভে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফর্কলিফট ওর প্রায় গায়ের ওপর উঠে এলো। কিছুই যখন করার নেই, মরিয়া হয়ে লাফ দিল রানা সামনে, ফর্কলিফটের দিকেই। শূন্যে পাক খেলো শরীরটা, মনে হলো দুনিয়াটা চক্কর খাচ্ছে। চওড়া একটা ব্লেডের কিনারা থেকে দু'ইঞ্চি দূরে একটা পা ফেলল রানা, ছোট্ট আরেক লাফে উঠে বসল সরাসরি ড্রাইভারের কোলের ওপর। ড্রাইভার ব্রেক কষে ফর্কলিফট দাঁড় করিয়ে ফেলল।

ফর্কলিফটের পিছু নিয়ে বহুলোক ছুটে আসছিল, কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে হকিস্টিক, কেউ ঘোরাচ্ছে লোহার চেইন।

একটা গুলি হলো। রানা করেনি। কিন্তু ড্রাইভারের খুলি উড়ে গেল। লাশটা ফেলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল রানা, তৃতীয়বারের চেষ্টায় রিভার্স গিয়ার এনগেজ করে পিছু হটতে শুরু করল।

ফর্কলিফটের চারপাশে মারমুখো জনতা। কেউ লাঠি চালাচ্ছে, কেউ লোহার চেইন ছুঁড়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। এক কসাই তার বড় ছোরাটা রানার পায়ে মারার জন্যে লক্ষ্যস্থির করছে। কোন লাভ হলো না, কারণ ওয়ালথারের একটা বুলেট দাঁত ভেঙে তার খুলির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে।

এভাবে দু'চারটে লাশ ফেলে হিংস্র হয়ে ওঠা জনতার হাত থেকে কেউ কোনদিন নিজেকে বাঁচাতে পারেনি, রানা উপলব্ধি করল সে-ও পারবে না। ওরা অসংখ্য, অথচ ও একা। ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে অস্ত্র আছে, ওদেরকে আরও খেপিয়ে তোলার জন্যে আছে ওয়াসিম মালিক আর তার এজেন্টরা। স্রেফ সময়ের ব্যাপার, মাসুদ রানা উন্মত্ত জনতার হাতে ছিন্নভিন্ন হতে যাচ্ছে।

খুন হবার আগে থ্রটল খুলে দিয়ে ফর্কলিফটের স্পীড বাড়িয়ে দিতে পারে রানা, আরও কিছু লোককে খুন করে গলি থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। চওড়া রাস্তায় একবার পৌঁছাতে পারলে বাঁচার একটা উপায় হলেও হতে পারে।

দুটো কারণে এই কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ও চাইছে না মার্কেটের আরও লোক আহত বা নিহত হোক। দ্বিতীয় কারণ গাইগা কাউন্টার। সেটার কাঁটা লাল দাগের কাছাকাছি পৌঁছেছিল ও যখন গলির শেষ মাথায় এসে দাঁড়ায়।

রিভার্স গিয়ার দিয়ে গলির অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে রানা। এবার ফর্কলিফটটাকে সামনে চালাল। ওর নাক বরাবর সামনে কাঠের প্রকাণ্ড একটা দরজা দেখা যাচ্ছে।

আট

পিছন থেকে গুলি হচ্ছে। সিটের পিছনটা লোহা না হলে রানার পিঠ ইতিমধ্যে পাঁচ-ছ'বার ফুটো হয়ে যেত। ফর্কলিফট সগর্জনে ছুটছে। সামনের দরজা ক্রমশ বড় হচ্ছে। প্রতিটি হাড় ও পেশিতে অনুভব করল রানা সংঘর্ষের ঝাঁকিটা। অসম্ভব ভারী ও দ্রুতগতি ব্লেড জোড়া ওক কাঠের অত্যন্ত শক্তিশালী কবাট ভেঙেচুরে সহস্র টুকরো করে ফেলল। রানার নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে মেশিনটা যেন খেপে উঠেছে। সামনে যা পাচ্ছে ছিন্নভিন্ন করে ঢুকে পড়ছে দালানের ভেতর। এটা কসাইদের একটা পাইকারী দোকান, আকারে বিশাল। দোকানের সামনের দিকে কোথাও একটা বালব জ্বলছে, সেটার ম্লান আলোয় সারির পর সারি ছায়া-ছায়া আকৃতির গরু হুকের সঙ্গে উল্টো হয়ে ঝুলতে দেখল রানা—জবাই করা, ছাল ছাড়ানো ও শুকানো।

ফর্কলিফট যথেষ্ট ভেতরে ঢুকিয়ে থামাল রানা, কেউ যাতে ওর পিছু নেয়ার জন্যে ওটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে। এঞ্জিন বন্ধ করে সাবধানে দরজার দিকে এগোল। মারমুখো জনতা কখনও হাল ছাড়ে না। তাছাড়া ওদের উত্তেজনা বাড়াবার জন্যে ওয়াসিম মালিক আর তার লোকজন তো আছেই।

দু'জন লোক দরজার দুই প্রান্ত থেকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল। দু'জনেই নিরাপদ ছায়া লক্ষ্য করে গড়িয়ে দিয়েছে শরীর। এই কৌশলের সারমর্ম হলো, রানা একই সঙ্গে দু'জনকে ঘায়েল

করতে পারবে না। ধারণাটাই ভুল। পিস্তলের ব্যারেল বরাবর দৃষ্টি ফেলে অপেক্ষা করছে রানা, দেখল দু'জনের একজন ছায়ার আরও ভেতর দিকে সরার জন্যে নড়ল। দালানের ভেতর কামান দাগার মত আওয়াজ করল গুলিটা। পাকিস্তানী এজেন্টের ক্রল থেমে গেছে। দ্বিতীয় লোকটা মারা গেল একটা টেবিলের নিচে ঢোকার সময়।

দালানের বাইরে থেকে কোন শব্দ আসছে না। জনবল ব্যবহারে ওয়াসিম মালিক আরও সাবধান না হলে আইএসআইকে প্রচুর লোক হারাতে হবে। মাংস রেখে কাটাকুটি করার একটা কাঠের ব্লক পেয়ে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, ভাবছে পাকিস্তানী দলের নেতৃত্ব দিলে এই পরিস্থিতিতে সে কি করত। উত্তরটা সহজ। এজেন্টদের রানা নির্দেশ দিত, বিল্ডিংটা ঘিরে ফেলো, তারপর সামনে ও পিছন দিয়ে ভেতরে ঢোকো।

এখান থেকে বেরুবার নিশ্চয়ই আরও পথ আছে। গাইগার কাউন্টার গলির ভেতর কোথাও পড়ে আছে। তবে শেষ রীডিং-এ দেখা গেছে এই দালানটা থেকেই রেডিওঅ্যাকটিভ সিগন্যাল পাচ্ছিল ওটা। তৃষা চৌধুরী যদি এই দালানে ঢোকার পর বেরিয়ে যেতে পারে, ও-ও পারবে।

তবে ওরা ওকে দালানের ভেতরটা সার্চ করার সময় দেবে না। দরজার মুখে চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি দেখা গেল, ওটার আড়াল নিয়ে ভেতরে ঢুকছে দু'জন লোক। একজন একটা টর্চ জ্বেলে দেখার চেষ্টা করল রানা কোথায় লুকিয়ে আছে।

ঠেলাটা খুব ধীরগতিতে ভেতরে ঢুকছে। টর্চের আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেছে। ব্লক-এর নিচে মাথা নামিয়ে রাখায় ভাল করে কিছুই দেখা হয়নি রানার। হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল মনে। এতক্ষণ ধরে গোলাগুলি হচ্ছে, পুলিস আসছে না কেন? পুলিস এলে মারমুখো জনতা সরে যাবে, ওয়াসিম মালিক আর তার

লোকজনকে পিস্তল লুকিয়ে ফেলতে হবে। দালানটা ঘিরে মাইকে ঘোষণা করা হবে, দালানের ভেতর যে-ই তুমি থাকো, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো। পুলিসের সামনে রানা বেরিয়ে এলে পাকিস্তানীরা ওর গায়ে একটা টোকাও দিতে পারবে না। পুলিসকে যা বলবার থানায় গিয়ে বলবে রানা।

কিন্তু ওয়াসিম মালিকের টাকার গরম কি এতই যে ফ্রেঞ্চ পুলিস তার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে? না, এ অসম্ভব! নাকি সম্ভব?

হাসি চেপে রাখতে রীতিমত কষ্টই হলো রানার। ঠেলাগাড়িটা যে পথ ধরে আসছে, কাঠের গুঁড়ি বা ব্লকটার ওপর দিয়ে চলে যাবে। এটা শুধু রানার ধারণা নয়, ঘটলও তাই। ব্লকটাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে, ব্লকের পিছনে গাঢ় ছায়ায় কেউ শুয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করল না। টর্চের আলো ফর্কলিফট ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, রানাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দেয়ালের গায়ে। ওই আলোতেই দেয়াল ঘেঁষে ওপর দিকে উঠে যাওয়া ধাপগুলো এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা। বেরুবার একটা পথ সত্যি বোধহয় আছে।

ঠেলাগাড়িটা ঠেলে আনছে দু'জন সালোয়ার পরা লোক, ঢোলা জোব্বা হাঁটু ছাড়িয়ে লম্বা। একজনের হাতে টর্চটা আবার জ্বলে উঠতে দু'জনের হাতেই একটা করে পিস্তল দেখতে পেল রানা। মাথায় নতুন একটা আইডিয়া গজিয়েছে, লোক দু'জনকে খুন না করে জখম করল রানা, দু'জনের একটা করে পায়ে গুলি করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পালাও, তা নইলে খুলি উড়িয়ে দেব!' লোকগুলোর আর্তচিৎকারকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা। ঠেলাগাড়ি আগেই ছেড়ে দিয়েছে, এবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার দিকে ছুটল। কিন্তু আজরাইল-রূপী ওয়াসিম মালিক ব্যাপারটা পছন্দ করল না, রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে দরজার আড়াল থেকে ওদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিল সে, মাথায় একটা করে গুলি করে। লোকটা মালিকই কিনা রানা দেখেনি, তবে সে ছাড়া

আর কে-ই বা এরকম একটা সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করবে?

দেরি না করে নতুন আইডিয়াটা কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ফর্কলিফটের ড্রাইভিং সিটে আবার বসল ও। প্রকাণ্ড গাড়িটা এতই চওড়া, আড়াআড়িভাবে রাখলে কবাটবিহীন দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। ওটাকে ওখান থেকে না সরানো পর্যন্ত ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। ফর্কলিফটের তলা দিয়ে ক্রল করে ঢুকবে? সে পথও বন্ধ করতে জানে রানা।

ফর্কলিফট দালান ছেড়ে বেরিয়ে আসছে মনে করে লোকজন নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। এই সুযোগে যান্ত্রিক দানবটাকে দরজার সামনে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করাল রানা। এঞ্জিন বন্ধ করে নিচে নেমে ছুটল, তবে মেঝে থেকে টর্চটা কুড়িয়ে নিতে ভুলল না। ছুটে এসে হুকের সঙ্গে ঝুলন্ত মুণ্ডুবিহীন প্রায় আস্ত একটা গরু কাঁধে তুলল ও, ওজনের ভারে কুঁজো হয়ে বয়ে নিয়ে এলো ফর্কলিফটের কাছে। এ-ধরনের জবাই করা গরু কসাইদেরকে বইতে দেখেছে রানা, তবে ওর ধারণা ছিল না একেকটা এত ভারী হতে পারে। এরকম চারটে গরু বহন করার পর ওর কাঁধ, পিঠ আর বাহুর পেশি থরথর করে কাঁপতে লাগল। তবে চারটেতেই ফর্ক লিফটের তলাটা প্রায় নিশ্ছিদ্রভাবে ভরাট হয়ে গেল, বাইরে থেকে ক্রল করে ভেতরে ঢোকা এখন আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ধাপগুলো বেয়ে এবার উঠবে রানা। দেখতে হবে ওপর দিকে কোন দরজা আছে কিনা। এতক্ষণে সাইরেন বাজিয়ে পুলিসের গাড়ি আসছে–আসুক, ধাপ বেয়ে ওঠার আগে একটু বিশ্রাম নেবে ও। সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

অকস্মাৎ রানার পিলে চমকে দিল একটা আওয়াজ। মানুষ বোধহয় ভূত দেখলেও এরকম চমকায় না। শব্দটা অবশ্য মিষ্টিই। 'তাহলে কি আপনিই?' প্রশ্নটায় সামান্য কৌতুকও আছে। 'বাংলাদেশী স্পাই মাসুদ রানা? নাকি আমার ভুল হচ্ছে?'

আওয়াজটার দিকে পিস্তল তুলল রানা, আরেক হাতে জ্বলে উঠল টর্চটা।

'যার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এত ঝামেলা পোহালাম, এখন তাঁরই গুলি খেতে হবে?' আবার বলল মেয়েটা, এবার বিশুদ্ধ বাংলায়।

'তৃষা চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল রানা। ধাপগুলোর ওপর, কামরার চারদিকে টর্চের আলো ফেলেও কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

'তারমানে ধরে নেয়া যায় আমি কোন ভুল করছি না, আপনি একজন বাঙালী, এবং নিশ্চয় মাসুদ রানাও।' হাসল মেয়েটা। 'আমি এখানে–ওপরে।'

টর্চের আলো আরও ওপরদিকে তাক করল রানা। প্রথমে ধবধবে ফর্সা একটা সরু পা উদ্ভাসিত হলো, সেটাকে অনুসরণ করে মাখন রঙা উরু হয়ে আলোটা আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে, ফলে দেখা গেল কাদা-পানি লেগে অসম্ভব নোংরা একটা ড্রেস কোমরের কাছে জড়ো হয়ে আছে। কাপড়ের স্তূপটা শক্ত করে ধরে আছে দুই হাত।

মেয়েটা পা ঝুলিয়ে বসে আছে উঁচু একটা কাঠের পার্টিশন-এর মাথায় রাস্তার সস্তা ও সহজলভ্য মেয়ে সাজার জন্যে মিনি স্কার্ট ও নামেমাত্র ব্রেসিয়ার পরতে হয়েছে, সেই সঙ্গে মুখে মাখতে হয়েছে রুজ আর লিপস্টিক থেকে শুরু করে যত রকমের যা কিছু পাওয়া যায়।

'আপনি ওখানে কি করছেন?' এই প্রশ্নটাই প্রথম এলো রানার মাথায়।

'হোটেলগুলো যখন নিরাপদ মনে হয় না তখন আমি এখানে এসে ঘুমাই। কসাই চাচারা টিনে ভরা দামী মাংস এখানেই রাখেন তো, তাই রাতে দোকানটায় তালা দেয়া থাকে। পরপর দুই রাত রাস্তায় হেঁটে কাটাবার পর এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি।'

'হোটেলগুলো কখন আপনার নিরাপদ মনে হয় না?'

'যখন মোটা নাদুসনুদুস এক লোক ওয়াসিম মালিকের জন্যে মেয়ে খুঁজতে আসে। বুঝতেই পারছেন, ভাল কোন হোটেলে আমি থাকতাম না।'

'আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে ওয়াসিম মালিক আর নাদুসনুদুস শোকরান দলবল নিয়ে এই দোকানের বাইরে অপেক্ষা করছে।'

হেসে ফেলল তৃষা চৌধুরী। 'আপনি আমাকে নিচে নামতে সাহায্য করুন, আমি আপনাকে এখান থেকে বেরুবার গোপন পথটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এবার রানাকে হাসতে হলো। 'কি কপাল! তৃষা চৌধুরী আমাকে পালাবার পথ দেখাবেন!'

'আরে, সত্যি বলছি!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বিশ্বাস করছি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আপনার সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু বিশ্বাস করতে রাজি আমি।'

ধাপগুলো বেয়ে দোতলায় উঠে এলো রানা। মেঝেতে বিয়ারের কয়েকটা ক্যান পড়ে আছে। দেয়াল ঘেঁষে সাজানো রয়েছে টিনে ভরা শুকনো মাংস। পার্টিশনের ওদিকে একটা খাট, কাজের ফাঁকে ক্লান্ত কসাইরা সম্ভবত বিশ্রাম নেয় এখানে।

তৃষার কোমর ধরে নামাতে যাচ্ছিল রানা, তার আগে সে-ই রানার কাঁধে হাত রেখে ছোট্ট একটা লাফ দিল, প্রায় নিঃশব্দে নেমে এলো মেঝেতে। জুতো পরছে, বাধা দিয়ে রানা বলল, 'মাথার ওপর হাইহিলের শব্দ হলে মালিক বা শোকরান কি ভাববে বলুন তো?'

জবাবে রানার গায়ে হেলান দিল তৃষা, কুঁজো হয়ে জুতোর স্পাইক খুলছে। এমনকি অন্ধকারেও মেয়েটার লম্বা পা আর সুগঠিত নিতম্বের প্রশংসা করতে হলো রানাকে।

মেঝেটা নিঃশব্দে পার হয়ে এলো ওরা। রানা পিছনে থাকল,

বিপদ এলে ঠেকাবে। একটা জানালা খোলার শব্দ রানার বুকে ভয় ঢুকিয়ে দিল। কে জানে কতদূর পর্যন্ত শোনা গেল। তবে না, নিচতলা থেকে পুলিসের হুইসেল ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না। জানালা গলে ছাদে উঠতে কোন সমস্যা হলো না, হাত বাড়াতেই নাগালে চলে এলো ছাদের কিনারা।

'পানির মত সহজ, তাই না?' চাপা হাসির সঙ্গে বলল তৃষা। 'এই ছাদের পিছন দিকে আরেকটা গলি আছে, সেটাও কানাগলি। তবে আমরা যদি আরও পাঁচটা ছাদ হয়ে পানির পাইপ বেয়ে নামি, যেখানে নামব সেখান থেকে রু সেইন্ট ডেনিস মাত্র পাঁচশো গজ দূরে।'

আলোকিত রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রথমেই তৃষাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার আঙটিটা কোথায়?'

'ও, আঙটিটা!' হেসে উঠল তৃষ্ণা। 'ওটা আমি লাজুলিকে রাখতে দিয়েছি। মায়ের প্রেজেন্ট করা তো, আমার খুব শখের জিনিস–ভাবলাম ধরা পড়লে ওরা যদি কেড়ে নেয়, তাই...'

'ঠিক আছে, ভাল করেছেন,' বলল রানা। 'এখন আমাকে একটা ফোন করতে হবে।' হাত তুলে একটা বুদ দেখাল ও।

প্রথমে রানা লাজুলির নম্বরে ডায়াল করল, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। তারপর রফিকের নম্বরে ডায়াল করল। একবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলল সে। 'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'খবর খারাপ, মাসুদ ভাই। আপনাকে আর তৃষাকে না পেয়ে ওয়াসিম মালিক পাগলা কুকুর হয়ে উঠেছে। আইএসআই এজেন্টরা রানা এজেন্সির প্যারিস শাখা ঘেরাও করে রেখেছে।'

রানা বলল, রফিকের প্রথম কাজ লাজুলিকে খুঁজে বের করে আঙটিটা চাওয়া। তারপর সকাল ন'টায় কাফে লা দুঁজা পাঁসনেতে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তৃষাকে নিয়ে একটা শপিংমলে ঢুকল রানা। সালোয়ার

কামিজ ও বোরকা পাওয়া যায়, এরকম একটা দোকান খুঁজতেই আধঘণ্টা বেরিয়ে গেল। প্রশ্ন করায় তৃষা জানাল রানার সঙ্গে ওর হোটেলে ফিরতে তার কোন আপত্তি নেই।

হোটেল স্যুইটে ঢোকার পর সোফায় বসে রানার দিকে তাকাল তৃষা। তার দৃষ্টি দেখেই রানা বুঝে নিল কি জানতে চাইছে মেয়েটা।

'আপনি নিজে থেকে এখনও কিছু বলেননি,' অবশেষে তৃষাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'তাই জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না। বাবা কি...'

'না,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্ল্যানটা সফল হয়নি। ওয়াসিম মালিক প্লেনটা হাইজ্যাক করে। আপনার বাবাকে জোর করে আবার পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা।'

তৃষার চোখে পলক পড়ল না, শুধু পানিতে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'সেক্ষেত্রে ওদের হাতে ধরা না পড়ার জন্যে আমি এত ছুটোছুটি করছি কেন? আমাকেও তো পাকিস্তানেই ফিরতে হবে।'

'পাকিস্তানে ফিরতে হবে মানে?' হঠাৎ রেগে উঠল রানা। 'ওরা দুনিয়ার সমস্ত ধানখেত নষ্ট করার পরিকল্পনা করছে জানার পরও আপনার বাবা ওই মৃত্যুবীজ বানাবেন, আর সেই কাজে আপনি তাঁকে সাহায্য করতে যাবেন? জানেন, মাত্র এক বছর ধানের কোন ফলন কোথাও যদি না হয়, না খেয়ে কত কোটি লোক মারা যেতে পারে? এ-কথাও কি ভেবে দেখেননি, যে কম্পাউন্ড ধানখেত নষ্ট করতে পারে, তা গম খেতও নষ্ট করতে পারবে? কল্পনা করতে পারেন, দুনিয়ার চেহারাটা কি দাঁড়াবে?'

'আপনার শেষ হয়েছে? এবার আমারটা শুনুন। আমি পাকিস্তানে যেতে চাইছি বাবাকে ওই মৃত্যুবীজ না বানাতে সাহায্য করার জন্যে। খুশি?'

'খুশি, কৃতজ্ঞ এবং ক্ষমাপ্রার্থী,' বলল রানা। 'আমাদের আরও

একটা প্ল্যান আছে। কাল সকালে সেটা ব্যাখ্যা করব। এখন শুধু এটুকু জেনে রাখুন, যেভাবেই হোক আপনার বাবাকে আমরা পাকিস্তান থেকে বের করে আনব।'

রানার কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল তৃষা। 'আমি ঘুমাব কোথায়!'

'বেডরুমে,' বলল রানা। 'আমি সিটিংরুমের এই লম্বা সোফায়। ইচ্ছে হলে দরজাটা আপনি বন্ধ করে দিতে পারেন।'

তৃষা দরজাটা বন্ধ করল কি করল না জানার সুযোগ হয়নি রানার। ও-ই আগে শোয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম থেকে জাগেও দেরি করে।

সকালে শাওয়ার সেরে কাপড়চোপড় পরল ওরা। রানা দাড়ি কামাচ্ছে, তৃষাকে বলল, 'পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বাবাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।'

'সে তো আমি কাল রাতেই লিখে রেখেছি,' সিটিংরুম থেকে বলল তৃষা। 'এখানে, টেবিলে রাখলাম।'

ন'টা নয়, আরও দশ মিনিট দেরি করে কাফে লা দুঁজা পাঁসনেতে পৌঁছাল ওরা। কিন্তু রফিক এসে পৌঁছায়নি এখনও। কাফেতে ঢোকার আগে একটা খবরের কাগজ কিনেছে রানা। মূল হেডিং হলো, মার্কেট ডিস্ট্রিক্ট লে হ্যালেসে আন্ডারগ্রাউন্ডের দু'দল অপরাধী চক্র পরস্পরের সঙ্গে প্রায় সারারাত বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

একটু পরই রফিককে কাফেতে ঢুকতে দেখল রানা। দেখেই বুঝে নিল, খবর ভাল নয়। চেয়ার টেনে বসল সে, বোরকা পরা তৃষার চোখ দুটো একবার দেখল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'লাজুলিকে কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, মাসুদ ভাই। তার অ্যাপার্টমেন্ট, হাউসবোট, মা-বাবার বাড়ি, অফিস, সবখানে খবর নেয়া হয়েছে–কোথাও নেই সে।'

‘ওয়াসিম মালিকের শ্যাতোয় খোঁজ নিয়েছ?’ জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর আপনমনে ক্ষোভ প্রকাশ করল, ‘কাল আমি ওকে বারবার নিষেধ করেছি নিজের কোন ঠিকানায় যেন না থাকে...’

‘মাসুদ ভাই, শ্যাতো সার্চ করতে হলে প্রথমে ফ্রেঞ্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগবে,’ বলল রফিক। ‘কারণ ওয়াসিম মালিকের বাবার কেনা ওই শ্যাতো কূটনীতিকদের অবসরযাপন কেন্দ্র হিসেবে ডিপ্লোম্যাটিক রেসিডেন্স-এর মর্যাদা চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান সরকার, কিছুদিন আগে সেটা পেয়েও গেছে তারা। আরও লাগবে পুলিস ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন, কারণ সার্চটা ওরাই করবে, তবে অনুরোধ করলে আমাদের একজন প্রতিনিধি সঙ্গে থাকতে পারবে। এ-সব অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার...’

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। ‘ঠিক আছে। ওদিকটা আমি দেখব। তোমার কাজ হচ্ছে, তৃষাকে নিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে যাওয়া। ফোন করে দু’জন ভাল উকিলকে ডাকবে, সাংবাদিকদেরও ডাকবে, তারপর তৃষার নিরাপত্তার জন্যে লিখিত আবেদন জানাবে। তাতে বলা হবে, তৃষা স্বেচ্ছায় পুলিসী হেফাজতে থাকতে চাইছে...কি ব্যাপার, রফিক, মাথা নাড়ছ কেন?’ রানা বিরক্ত।

‘পুলিস ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মকর্তা ওয়াসিম মালিকের বন্ধু, মাসুদ ভাই,’ বলল রফিক। ‘তারচেয়েও খারাপ খবর, পুলিসী হেফাজতে থাকা অবস্থায় গত এক বছরে সাতজন খুন হয়েছে। জেলখানার ভেতরই একটা গ্রুপ আছে, তাদেরকে টাকা দিয়ে যাকে ইচ্ছে তাকে খুন করানো যায়।’

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। রফিকের কথা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। ‘আমি চাইনি এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের দূতাবাসকে জড়াই। কিন্তু আমাদের সেফহাউস এখান থেকে এত দূরে যে তৃষাকে পাঠাতে ভয় করছে। পুলিস হেডকোয়ার্টারে নয়, ওকে

তুমি বাংলাদেশ দূতাবাসে রেখে এসো।' তৃষার দিকে ফিরল রানা। 'ওখান থেকে ভুলেও তুমি বাইরে বেরুবে না। আমি বা রফিক যদি কোন কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পারি, দূতাবাসের কর্মকর্তারাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন কি করা হবে। ঠিক আছে?'

'কি করে ঠিক থাকে?' ম্লান কণ্ঠে বলল তৃষা। 'এমন সুরে কথা বলছেন যেন জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না। সেটাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে বলবার কিছু নেই আমার। তবে সারা জীবনই মনে একটা দুঃখ পুষে রাখতে হবে।'

'দুঃখ পুষে রাখতে হবে?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'কেন?'

'আমাদের ওদিকের মেয়েদের এটাই তো সমস্যা, এরকম অনেক "কেন"-র উত্তর তারা দিতে পারে না,' তৃষার গলাটা আরও বিষণ্ন শোনাল। 'বাড়িতে অতিথি আসলে তাকে আপ্যায়ন করাটাই তো রেওয়াজ, তাই না। কিন্তু কারও জীবনে যদি উপকারী কোন বন্ধু আসে? তার সঙ্গেও একটা সম্পর্ক তৈরি করা রেওয়াজ নয়?'

অকস্মাৎ রানার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল লাজুলি। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন আহ্বান জানাচ্ছে দয়িতকে। 'আমার অভাব পূরণ করো। ঈশ্বরের কসম, এই মুহূর্তে আমার চোখে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ তুমি; আর মা মেরির কসম, বহু পুরুষকে বলতে শুনেছি সর্বকালের সেরা সুন্দরীদের একজন আমি। ভেবে দেখো, রানা, শুধু একবার ভাবো... আমাকে ফিরিয়ে দেয়া কি তোমার উচিত হবে? যখন স্বেচ্ছায়, কোনরকম দাবি ছাড়াই নিজেকে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে?'

'কি, রেওয়াজ নয়?' আবার জিজ্ঞেস করল তৃষা।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, রেওয়াজ।' ওর মনে পড়ল, লাজুলির ওই কথার পর শুধু একটা প্রশ্নই করতে পেরেছিল ও – পরে পস্তাবে কি না। আসলে মেয়েটার প্রচণ্ড

আবেগ ওর প্রতি তীব্র ভালবাসাও, অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি। এদিকে আরেক মেয়ে, তৃষা, কি বলতে চাইছে কে জানে। 'তো কি ধরনের সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছ তুমি আমার সঙ্গে—মানে, আমিই যদি তোমার সেই উপকারী বন্ধুটি হয়ে থাকি?'

'বন্ধুটি আমার খুব আদরের ভাই হতে পারেন না?' প্রত্যাশায় চকচক করে উঠল তৃষার চোখ দুটো। 'আপনি তো বোধহয় জানেনই, মাসুদ ভাই, মা-বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আমার একটা ভাই সত্যি খুব দরকার।'

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা অত্যন্ত সাবধানে ও একটু একটু করে ছাড়ল রানা। 'তোমার এই অভাব অবশ্যই আমি পূরণ করব, তৃষা। এবার, প্রিয় ভগ্নী, রফিকের সঙ্গে রওনা হয়ে যাও, কেমন?' রফিকের দিকে তাকাল ও। 'দূতাবাস তো মাত্র আধ মাইল দূরে, হেঁটে চলে যাও তোমরা। তোমার গাড়িটা আমার দরকার। পথে কেউ বিরক্ত করলে বা বাধা দিলে সরাসরি খুন করার জন্যে গুলি করবে। তারপর যা-ই ঘটুক, আমি সামলাব।'

নয়

রফিকের সিত্রোঁ নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। ট্র্যাফিক জ্যাম মেজাজটাকে সপ্তমে চড়িয়ে দিচ্ছে। লাজুলির কাছে তৃষার যে আঙটিটা আছে সেটার তাৎপর্য ওয়াসিম মালিক যদি না জানে, তার হাতে লাজুলি ধরা পড়ে থাকলে এবার অবশ্যই জেনে ফেলবে। লাজুলি সহজে মচকাবার মেয়ে নয়, তবে ওয়াসিম

মালিকও পাকিস্তানী ইন্টারোগেশন স্কুলে শুধু হাত মোচড়াতে শেখেনি।

আইএসআই যদি সামান্য একটু আভাস পায় যে বিসিআই প্রফেসর ফারুক চৌধুরীকে পাকিস্তান থেকে বের করে আনার প্ল্যান করছে, সঙ্গে সঙ্গে দূরে ও গোপন কোথাও সরিয়ে ফেলা হবে তাঁকে। কিংবা, এমনও হতে পারে, তাঁকে হারাবার ভয়ে হয়তো মেরেই ফেলবে।

হাউসবোটে মাত্র এক মিনিটের জন্যে যাচ্ছে রানা। ছোটখাট গোপন জিনিস লাজুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে ওর তা জানা আছে, সেই জায়গাটা একটু দেখবে শুধু। ওয়াসিম মালিকের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে যাবার আগে আঙটিটা ওখানে যদি রেখে গিয়ে থাকে সে।

হাউসবোটে ঢুকে কোথাও কোন ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখল না রানা। তবে এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। দরজা খোলা, তালা দেয়া নয়। বড় টেবিলটার গোপন দেরাজটা চেক করল ও। নেই।

গোটা হাউসবোট আগেই চেক করেছে, এবার গাড়ি নিয়ে ওয়াসিম মালিকের শ্যাতোয় যেতে হবে। তবে তার আগে আরেকটা জিনিস চেক করা দরকার। ধীর ও শান্ত ভঙ্গিতে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, তারপর ছোট্ট এক লাফ দিয়ে চলে এলো পরিত্যক্ত বার্জটায়। এই বার্জেই সেই আধবুড়ো বার্নি, কুঁড়ের বাদশাটা, আস্তানা গেড়েছে।

হাউসবোটের মতই এই বার্জটাও খালি মনে হচ্ছে। তারপরই হঠাৎ রানার স্পর্শকাতর কানে ডেকের নিচে থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকল।

অন্ধকার হোল্ড-এ তাকে পেল রানা। রেখা ও ভাঁজবহুল মুখে শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে রক্ত, ছেঁড়া ও নোংরা কোটটা ভেজা। পালস দেখল ও। লোকটা গোঙাল। চোখের পাতা কয়েক বার কাঁপল, তারপর তাকাল সে, কথা বলতেও চেষ্টা করল। কিন্তু

শব্দগুলো রানা ধরতে পারল না।

'আপনার একজন ডাক্তার দরকার,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজনকে পাঠাব আমি। আপনি পুলিসকে খবর দেননি কেন?'

'আমি কোন রকম ঝামেলা পছন্দ করি না,' কোনরকমে বলল বুড়ো। 'তবে ওদেরকে আমি বাধা দিতে চেষ্টা করেছি...,' এটুকু বলার পর লোকটার সব শক্তি যেন ফুরিয়ে গেল।

হাউসবোটে ফিরে এসে পুলিস ও অ্যামবুলেন্সে ফোন করল রানা, তারপর ধাপ বেয়ে উঠে এসে গাড়িতে চড়ল।

পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মাথায় স্পষ্ট কোন প্ল্যান ধরে রাখতে পারছে না রানা। সিত্রোঁর স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে একের পর এক ওভারটেক করছে ও।

গাড়ি থেকে নামল রানা রফিক যে ফাঁকা জায়গাটায় ট্রাক নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করেছিল। শ্যাতোর লে-আউট ওর মাথায় গাঁথা আছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোবার সময় ওর জানা আছে ঠিক কোথায় যাচ্ছে। শিশিরে ভেজা পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। গাছপালার ফাঁকে এক সময় শ্যাতোটা দেখা গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত উপলব্ধি করল ভুলটা কোথায় করেছে। ওয়াসিম মালিক তো জানেই লাজুলির খোঁজে শ্যাতোয় আসবে ও, কাজেই তারা তো ওকে ধরার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে। একটা ঝোপ থেকে একজোড়া কুকুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসছে দেখে ভুলটা ধরতে পেরেছে রানা। দুটোই ডোবারম্যান। প্রথমটা রানার গলায় কামড় বসাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মারা গেল। বুলেটের ধাক্কায় শূন্যে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর খসে পড়ল রানার পায়ের সামনে। দ্বিতীয়টা একটু পরে লাফ দিয়েছিল, সরাসরি রানার বুকে এসে পড়ল।

কুকুরটাকে বুকে নিয়ে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ল রানা। ধারাল দু'সারি দাঁত ফাঁক করে রানার গলাটা মুখের ভেতর টেনে নিতে

চাইছে ডোবারম্যান, পারছে না রানার একটা হাত মাঝখানে বাধা হয়ে থাকায়। রানার অপর হাতে ইতিমধ্যে ছুরিটা বেরিয়ে এসেছে। ছুরির ফলাটা ডোবারম্যানের বুকে গাঁথতে যাচ্ছে ও। এই সময় মনে হলো কেউ ওর খুলির পিছনে বোমা মেরেছে। প্রচণ্ড, অসহ্য ব্যথা; তারপর সব অন্ধকার।

কয়েক ঘণ্টা নাকি কয়েক দিন পর বলতে পারবে না রানা, অনুভব করল ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে ওর। চোখে আলো লাগছে। কানে শব্দ আসছে। মুখে বারবার ব্যথা পাচ্ছে, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারছে না। চোখ মেলল। মুখে বোকা বোকা হাসি, চোখে অলস দৃষ্টি–এ সেই শোকরান, ওয়াসিম মালিকের স্যাডিস্ট বডিগার্ড। এতক্ষণে বুঝতে পারল রানা, শোকরান ওকে চড় মারছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো ঠিকই, তবে আবিষ্কার করল ওর হাত দুটো খুব শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

শোকরানের চোখে চোখ রেখে নরম করে হাসল রানা। 'শোকরান,' প্রায় আদরের সুরে বলল, 'তুমি যদি এটা বন্ধ না করো, তোমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফুটবল খেলব আমি। কি বললাম বুঝতে পেরেছ?'

পরের চড়টা আরও জোরে মারল শোকরান। পিছন থেকে কে যেন চাপা গলায় হেসে উঠল। গলাটা চিনতে পারল রানা। ওয়াসিম মালিক ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

'রানার জ্ঞান ফিরেছে, শোকরান, কাজেই তোমার এখন অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত,' বলল সে। 'রানা শুধু বিপজ্জনক একটা চরিত্র নয়। অনেকেই ওকে জাদুকরও বলে। ধরা পড়লেও কিভাবে যেন হাত ফস্কে বেরিয়ে যায়।'

রানার গালে আবার চড় কষল শোকরান।

'আর কি মারার দরকার আছে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াসিম মালিক, মার্জিত কণ্ঠস্বর।

শোকরান রানার সামনে থেকে সরে গেল। সরাসরি রোদ পড়ায় চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল রানার, মাথাটা ঘুরিয়ে নিল ও। জানালার পাশে একটা কাঠের আর্ম চেয়ারে বসে রয়েছে ওয়াসিম মালিক, তার সুগঠিত মাথা ঝুঁকে রয়েছে দাবার একটা বোর্ডে। তার পাশে, মেঝেতে, ছোট্ট একটা পোর্টেবল রেডিও অন করা রয়েছে–যান্ত্রিক শব্দজট ছাড়া আর কিছু বেরুচ্ছে না স্পীকার থেকে। হাত বাড়িয়ে রেডিওটা তুলে মালিক বলল, 'শ্যাতো থেকে বলছি। শিকার অভিযান শেষ হয়েছে। সবগুলো ইউনিটকে ডেকে নিয়ে কাজে পাঠিয়ে দাও।' এতক্ষণে রানার দিকে তাকাল সে। 'দাবা তো খেলোই, তাই না?'

'ইদানীং আর সময় পাচ্ছি কোথায়।'

'আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘুঁটিকে বাঁচাবার জন্যে বোড়েকে বিসর্জন দেয়া হয়,' প্রশ্ন নয়, এমনি বলা।

রানা ভাবছে, সিল্ক স্পোর্টস শার্ট আর ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি জ্যাকেট পরে তৈরি হয়ে আছে মালিক, কোথাও নিশ্চয় যাবে। কিন্তু ওর সঙ্গে তার খেলাটা আসলে কি?

'এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে বোড়ে যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চৌরাস্তা আগলে রাখে, কি বলো?'

রানা কোন মন্তব্য করছে না।

'আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম,' মালিক বলে যাচ্ছে, 'ওয়াসিম মালিক, বাংলাদেশ একটা বোড়েকে প্রটেকশন দেয়ার জন্যে তাদের রানীকে কেন পাঠাবে? বোড়েটা আসলে কি রক্ষা করছে?'

'প্রশ্নটা তুমি বোড়েকে করোনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'খুবই দুঃখের বিষয় যে কাজের চাপে বাধ্য হয়ে বোড়েকে ইন্টারোগেশনের দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমার অন্ধভক্ত, বোকা-সোকা বডিগার্ডকে। দয়া দেখাবে বা মাত্রা বোধের পরিচয় দেবে, এ-সব তার কাছ থেকে আশা করা বোকামি। সত্যি দুঃখিত।'

তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় খিক খিক করে হাসল শোকরান।

'একটা প্লাস্টিকের পুতুলকে যেমন ভাঙা যায়, মেয়েটাকে প্রায় সেভাবে ভেঙে ফেলেছে,' বলল মালিক, ঠোঁটের সুন্দর হাসিটা দেখে মনে হবে নিজের মেয়ের গুণগান গাইছে। 'এখন তাকে একটা আবর্জনাই বলা যায়। নোংরা। এতক্ষণ বোধহয় বেঁচেও নেই। অন্তত থাকার কথা নয়।'

রানার বুকের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে। ঈশ্বরের এ কেমন বিচার! মুক্ত-স্বাধীন একটা পাখির মত নীল আকাশে উড়ে বেড়াতে চেয়েছিল শুধু, এটাই কি তার অপরাধ, আর সেই অপরাধের এত বড় শাস্তি?

আল্লাই জানে লাজুলিকে নিয়ে কি করেছে ওরা। তবে এটা পরিষ্কার যে সে মুখ খোলেনি।

'তবু,' আবার বলল মালিক, 'আমরা হলাম যোদ্ধা। কোন যুদ্ধে যখন হেরে যাই, নতুন করে একত্রিত হই সবাই, ক্ষতির পরিমাণ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনি। তোমাকে আমি খুলেই বলি। আমার একটাই কৌতূহল। লাজুলির জন্যে কেন তুমি এখানে এসেছ?'

রানা দ্রুত চিন্তা করছে। মালিক খুব ভাল করেই জানে এই প্রশ্নের উত্তর সে পাবে না। টরচার শুরু করতে অযথা দেরি করছে না?

'তুমি বোকা নও, রানা। শুধু মেয়েটার জন্যে দরদ অনুভব করে আসোনি।' মাথা নাড়ল মালিক। 'তার কাছে এমন কিছু ছিল যেটা তোমার দরকার।'

রানা ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত থাকল, ওয়াসিম মালিককে বুঝতে দিতে চায় না যে তার চিন্তা-ভাবনা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। আসলেও লাজুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে বলে আসেনি ও। রওনা হবার আগেই প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল, লাজুলিকে আইএসআই বাঁচিয়ে রাখবে না, বিশেষ করে এ-কথা জানার পর যে বিসিআইকে সরাসরি সাহায্য করছে সে।

খিক খিক করে হেসে উঠে মালিকের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল শোকরান। 'হুজুর যদি অনুমতি দেন তো বঙ্গালী বাবুর নখের ভেতর গরম সুঁই ঢোকাই, হড়হড় করে জবাব বেরিয়ে আসবে,' প্রস্তাব দিল সে।

টকটকে লাল হয়ে উঠল মালিকের মুখ। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, কষে এমন এক চড় মারল ছিটকে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলো শোকরান।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াল সে, করজোড়ে ক্ষমা চাইছে, মুখে সেই বোকা বোকা হাসি।

'তুমি তখনই কিছু করবে, যখন তোমাকে সেটা করতে বলা হবে,' বলল মালিক। 'তোমার বোকামির জন্যেই এখন আমাকে এখানে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে, অন্য জায়গার জরুরী কাজ ফেলে।'

মালিকের সামনে এসে দাঁড়াল শোকরান। ফোলা ফোলা মুখে পাঁচ আঙুলে দাগ নিয়ে হাসছে।

সম্ভবত তার এই বোকা বোকা হাসিটাই আরও খেপিয়ে তুলল মালিককে। কাঁধে একটা হাত রেখে শোকরানকে স্থির রাখল সে, অপর হাতের আঙুল দিয়ে তার ডান স্তনের বোঁটা ধরে মোচড়াল। এবার শব্দ করে হেসে উঠল শোকরান। মালিক ছাড়ছে না। তার হাতের পেশি যেভাবে শক্ত হয়ে উঠছে, রানার মনে হলো শোকরানের বোঁটাটা না ছিঁড়ে ফেলে সে।

শোকরানের হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, তবে আওয়াজটা থামলও না; হাসিটাই একসময় কান্নায় রূপান্তরিত হলো।

এবার তার বুক থেকে হাতটা টেনে নিল মালিক। পরমুহূর্তে শিউরে উঠল রানা, কারণ মালিক ছেড়ে দিতেই আবার সেই খিক খিক শব্দে বোকার মত হাসতে শুরু করেছে শোকরান।

রানার দিকে ফিরল মালিক, নিপাট ভদ্রলোকের ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে, যেন কিছুই ঘটেনি। 'হিসাবটা তো খুব সহজই, তাই না?

হারাবার কিছু আছে তোমার? কিংবা পাবার কিছু? আইএসআই তোমাকে ধরেছে, তারমানেই তুমি মারা গেছ। কিন্তু না, আইএসআই তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চায়। কি সুযোগ?

'লাজুলির কাছে কি ছিল বলো আমাকে, রানা, বিনিময়ে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। না-না, এর মধ্যে মহত্ত্ব খুঁজতে যেয়ো না। বরং আমার একটা স্বার্থ আছে। আমি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মান করি, তাদের সঙ্গে লড়ে মজা পাই। তুমি নিজেকে আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণ করেছ। সত্যি কথা বলতে কি, ভবিষ্যতে লড়ার সুযোগ হারাব, এটা ভাবলেই তোমাকে খুন করতে মন চাইছে না। কিন্তু উপায় নেই, মরতে তোমাকে হবেই–না, হবে না; শুধু যদি বলো লাজুলির কাছ থেকে কি পাবার আশায় এসেছ তুমি।'

রানা কিছু বলছে না।

'ও, তোমাকে বলাই হয়নি!' নরম, অমায়িক সুরে বলল মালিক। 'তৃষাকে তোমরা ধরে রাখতে পারোনি। সে এখন আমাদের হাতে।'

রানার মাথায় যেন বাজ পড়ল। 'শালা ধাপ্পা মারার জায়গা পাও না, না!'

নিজের জুতোর ডগার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড আপনমনে হাসল মালিক, তারপর মুখ তুলে বলল, 'এই মুহূর্তে একটা প্লেনে রয়েছে তৃষা চৌধুরী, প্লেনটা অবশ্যই বাংলাদেশে যাচ্ছে না।' পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে পাতা ওল্টাল। 'বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে যাচ্ছিল সে, পরনে ছিল কালো বোরকা। আজ সকাল সাড়ে দশটার ঘটনা। তৃষার সঙ্গে তোমাদের দূতাবাসের এক অফিসারও ছিল। তাকে গুলি করা হয়নি, কারণ আমি যে মার্সেনারিদের ভাড়া করি তারা স্থানীয় বলে নিজেদের এলাকার কোন দূতাবাসের লোককে খুন করতে রাজি হয়নি।

'তোমাকে এখন সব কথা বলতে অসুবিধে নেই। যখনই বুঝতে পারলাম মেয়েটা লে হ্যালেস এলাকায় লুকিয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় গ্যাঙ লীডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমাদের হয়ে তাদেরই একটা গ্রুপ নজর রাখছিল রু সেইন্ট ডেনিস এলাকায়। মেয়েটা যে তোমার হোটেল স্যুইটে রাত কাটিয়েছে, তাও আজ সকালে আমি জানতে পারি। এক্সকিউজ মি. মালটা কিন্তু খাসা, তাই না? সত্যি তুমি ভাগ্যবান!'

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে রানার। ভাবছে, ও নিজে কেন তৃষাকে দূতাবাসে পৌঁছে দিতে গেল না।

'এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য রানা। সহযোগিতা করলে তুমি ঠকবে না, অসহযোগিতা করার কোন কারণও নেই।'

হুঁ, ভাবল রানা, আমি সহেযোগিতা করি আর বিনিময়ে মাফ চেয়ে নিয়ে তুমি একটা গুলি করো। মালিক এটুকু বুঝতে পারছে যে লাজুলি ধাঁধার একটা অংশ, আর সেই অংশটা ছাড়া তৃষা চৌধুরী নিশ্চয়ই তার তেমন কোন কাজে লাগবে না, তা না হলে জিনিসটা হাতে পাবার জন্যে এখানে আমি হানা দিতে আসতাম না। বিজ্ঞানী ফারুক চৌধুরীকে দেখাবার জন্যে আঙটিটা মালিকের দরকারও হবে–তৃষা যদি পালায় বা আত্মহত্যা করে। যা শালা, আঙুল চোষ!

'তৃষা তার বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছে, রানা,' বলল মালিক; শান্ত গলা, পরিশীলিত, বাংলা যেন তার মাতৃভাষা। 'আমরাও চলে যাচ্ছি, যদিও আমাদের সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। চলে যেতে হচ্ছে বলতে পারো অনেকটা বাধ্য হয়েই। তোমাকে বোধহয় বলেছি, আমার বোকা বডিগার্ডের ইন্টারোগেশন পদ্ধতি একটু নোংরা। তো ওর সেই নোংরামির কারণে প্রতিবেশীরা একটু বিরক্ত বোধ করেছে। বিরক্তি কেটে গিয়ে তাদের মনে শান্তি ফিরে আসুক, তখন আবার আমরাও ফিরে আসব। সেজন্যেই বলছিলাম, রানা, তোমার উত্তরটা এখনই আমাকে পেতে হবে।'

'লাজুলিকে নিয়ে শোকরান ঠিক কি করেছে বলো তো?' রানার শান্ত প্রশ্ন।

চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলল মালিক, একটা বাক্স থেকে নিয়ে চুরুট ধরাল, ভদ্রতাসূচক ইঙ্গিতে জানতে চাইল রানাও ধূমপান করবে কিনা, তারপর এক মুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এখানে আমাদের ইন্টারোগেশন রুম আছে, কিন্তু শোকরান সেটা ব্যবহার করেনি। আমি বলব, লাজুলির রূপ-যৌবন ওকে অতিমাত্রায় কৌতূহলী করে তোলে।' কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তা না হলে এরকম উদ্ভট একটা এক্সপেরিমেন্ট কেনই বা সে করতে যাবে।'

'এক্সপেরিমেন্ট?' রানার গলা শুকনো ও ঠাণ্ডা।

'লাজুলিকে উলঙ্গ করে আস্তাবলে নিয়ে যায় শোকরান।' হেসে উঠল মালিক। 'একটা পাগল আর কি! আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে একটা মাদী ঘোড়ার ভ্যাজাইনাল এক্সক্রিশন–উত্তেজিত করে তোলার জন্যে আর কি–লাজুলির গায়ে মাথায়, তারপর রশি দিয়ে ওকে বেঁধে দেয় আমার নতুন কেনা স্ট্যালিয়নটার পেটে। ফলটা কি হয়েছে...' অসহায় ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'পাশে মেলে শ্রাগ করল সে।

মাথার ভেতর হঠাৎ যে আগুনটা জ্বলে উঠল সেটা নেভাবার কোন উপায় দেখতে পেল না রানা।

'লাজুলির চিৎকার, বলাই বাহুল্য, আমাদের এখানকার স্থানীয় কর্মচারীদের সচকিত করে তোলে। অবশ্য সময়মতই তাকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে আসলে ঠিক কি ঘটেছে বিভিন্ন ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি তা আন্দাজ করে নেবে।'

অনেক কষ্টে মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে রানা। ওয়াসিম মালিক কি বলছে এখন আর শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু আস্তাবলের দৃশ্যটা মাথা থেকে সরানো বা মুছে ফেলা অসম্ভব মনে হচ্ছে। চেয়ারের হাতলে বসা শোকরানের খিক-খিক হাসি আরও

অসুস্থ করে তুলল ওকে।

মালিক এখনও কথা বলে যাচ্ছে। 'উত্তরটা আমাকে এখনই পেতে হবে, রানা।'

কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এলো।

'কি হলো, রানা?'

'আমার কিছু বলার নেই,' জবাব দিল রানা।

'তুমি বোকা,' মালিকের গলায় তিরস্কার। 'কারণ বিকল্প ব্যবস্থা হলো, এখানে শোকরানের কাছে রেখে যাওয়া হবে তোমাকে, সে তার পছন্দ মত পদ্ধতিতে তোমার কাছ থেকে উত্তরটা আদায় করবে।'

'দু'জনকেই বলছি, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকো,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'নিজেদের ভাল চাইলে এই মুহূর্তে আত্মহত্যা করে জাহান্নামে চলে যাও, কারণ আমার প্রতিশোধ নরকযন্ত্রণার চেয়েও ভয়ংকর হবে।'

মালিককে রানা বলতে শুনল, 'ঠিক আছে, শোকরান, ওকেও তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হলো।' জুতোর শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল

দশ

গোটা এলাকা 'নীল ঘাস অঞ্চল' নামে পরিচিত, তারই শেষ প্রান্তে ওয়াসিম মালিকের শ্যাতো। এলাকাটার বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে উন্নত মানের রেসের ঘোড়া পয়দা করা হয়। পুরানো গাইডে

শ্যাতোটাকে ‘ওয়ান স্টার’-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তাতে প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কার্ডিনাল রিচলিউ সম্ভবত সাময়িক নিখোঁজ থাকার প্রয়োজনে এই জায়গাটা খুব পছন্দ করতেন, এবং রাজনৈতিক বন্দীদের ইন্টারোগেশন পয়েন্ট হিসেবেও ব্যবহার করতেন। ওয়াসিম মালিকের বাবা শ্যাতোটা লীজ নেয়ার পর থেকে বাইরের সাধারণ লোকজনের ভেতরে ঢোকা নিষেধ করে দেয়া হয়।

কার্ডিনাল বেঁচে থাকলে এখন আর তাঁর শ্যাতোটাকে চিনতে পারতেন বলে মনে হয় না। প্রতি কামরার মেঝে মোজাইক করা হয়েছে। দেয়ালে আঁকা হয়েছে গ্রীক দেব দেবীদের নগ্ন ছবি। রানাকে রাখা হয়েছে বেশ বড় একটা কামরায়। কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রয়োজনীয় সমস্ত ইকুইপমেন্টসহ, ইলেকট্রনিক্যালি মোটরাইজড্ একটা অপারেটিং টেবিল। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে লাশ রাখার স্লাইডিং ড্রয়ার সহ একটা ফ্রিজার কমপার্টমেন্ট। আরেক দেয়ালের সারি সারি র‍্যাকে সাজানো রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ ভর্তি বোতল ও জার। কয়েকটা ডিকটেটিং মেশিনও দেখা যাচ্ছে।

শোকরান তার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। আত্মভোলা একজন অধ্যাপকের মতই লাগছে তাকে, যেন পরবর্তী ক্লাস নেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

শোকরানকে খুন করতে পারলে নিজের জান বাঁচানো যায়, চিন্তা করছে রানা। কিন্তু কিভাবে? প্রথম কাজ বন্ধন মুক্ত হওয়া। অনুরোধ করলে শোকরান কি বাঁধনগুলো খুলে দেবে?

‘হি-হি!’ রানাকে আপনমনে হাসতে দেখে শোকরানও হাসল। ‘আপনার মত আমারও হাসি পাচ্ছে। আমার তো এমনি এমনি হাসি পায়। আপনার?’

রানা ভাবছে, একটা জিনিস ওর অনুকূলে–সময়। শ্যাতোয় পুলিস আসতে পারে। শোকরানকে নিশ্চয়ই বলা আছে যে

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে শ্যাতো ত্যাগ করতে হবে তাকে।

নিজের টেবিল থেকে নাদুসনুদুস শোকরান এতক্ষণে রানার দিকে হেঁটে আসছে, হাত দুটো পিছনে লুকানো। সারা শরীর টান টান করল রানা। ইতিমধ্যে আট-দশবার বাঁধনমুক্ত হবার চেষ্টা করেছে ও। গিঁটগুলো যেই দিয়ে থাকুক, সে তার কাজ বোঝে।

কাছাকাছি এসে একেবারে হঠাৎ রানার মুখে ক্লোরোফর্মে ভেজানো খানিকটা তুলো চেপে ধরল শোকরান। আন্দাজ করতে পারছিল এরকম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, দ্রুত একবার শ্বাস টানার সময় পেল রানা। গন্ধটা মিষ্টি, তবে সময়মত দম আটকে ফুসফুসে প্রায় কিছুই ঢুকতে দিল না। হাত দিয়ে তুলোটা ঠেলে সরাবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু চর্বি থলথলে হলে কি হবে শোকরানের গায়ে অবিশ্বাস্য শক্তি। একমিনিট পর জ্ঞান হারাবার ভান করল রানা। কে বলে বোকা, রানার নাকে ভেজা তুলোটা আরও ত্রিশ সেকেন্ড চেপে ধরে রাখল শোকরান।

'ভিনদেশী কাফের শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন।' কেউ যেন কাতুকুতু দিচ্ছে, অন্তত শোকরানের হাসি শুনে তাই মনে হলো। 'কিন্তু আমি বোকাসোকা শোকরান নিশ্চিত হব কিভাবে?'

অকস্মাৎ শক্ত কিছু একটা আঘাত করল রানার পেটে, মনে হলো রাইফেলের বুলেট ঢুকেছে। কুঁকড়ে গেল রানা, শ্বাস টানল; বাতাসের বদলে ফুসফুসে ঢুকল ক্লোরোফর্ম। ওর জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরল অপারেটিং টেবিলে। তেমন কোন কষ্ট হচ্ছে না, শুধু সরাসরি মুখের সামনে একটা আলো জ্বলছে। এটা একটা বিশেষ টেবিল। রোগীর হাত ও পা বেঁধে রাখা হয়েছে।

রানার পরনে কোন কাপড় নেই। চামড়ার কাছাকাছি পৌঁছেছে এমন সব প্রধান স্নায়ুর শেষ প্রান্তগুলোয় টেপ দিয়ে ইলেকট্রোড বসানো হয়েছে।

'আমার বোধহয় তোমাকে সব কথা বলে ফেলা দরকার, কি

বলো, শোকরান?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সেক্ষেত্রে তোমার ঝামেলাও কমবে, আমাকেও কষ্ট পেতে হবে না।'

'আমি বোকা, তবে এত বোকা নই যে আপনার চালাকি ধরতে পারছি না।' অদৃশ্য হাতের কাল্পনিক সুড়সুড়ি খেয়ে হাসতে লাগল শোকরান। 'আপনি কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে আমাকে পটাতে চাইছেন। কিন্তু আমি কি এত বোকা যে মজা করার সুযোগ পেয়ে সেটা হাতছাড়া করব?'

'আজকের দিনটা বলতে গেলে তোমার জন্যে উৎসব হয়ে দেখা দিয়েছে, কি বলো?'

শোকরান উত্তর দিল না। রানার দৃষ্টি সরাসরি সামনের জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এ কামরায় এই একটাই জানালা, যথেষ্ট লম্বা, গাছগালার মাথার ওপর সচল মেঘ আর নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছে ও। লাজুলির কথা মনে পড়ে গেল। আর ঠিক তখুনি শুরু হলো ব্যাপারটা।

যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে চালু হলো একটা ইলেকট্রিক মোটর, সারা শরীরে একই সঙ্গে ছ'টা আলাদা জায়গায় শক খেলো রানা। ঝাঁকিতে যেন থেমে গেল হার্ট বিট, শরীরটা প্রচণ্ড খেপে গিয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ছুটে পালাতে চাইল, শিরদাঁড়া ইস্পাতের ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে, ব্রেন সেল থেকে উল্টোপাল্টা সার্কিটে ছড়িয়ে পড়া শব্দহীন কোলাহলে ভরে গেল মাথার ভেতরটা। যেমন হঠাৎ চালু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল মেশিন। শরীরটা শিথিল হয়ে গেল, আরাম বোধ করছে। বড় করে শ্বাস নিচ্ছে রানা। মাথার ভেতর এত ব্যথা, বমি পাচ্ছে ওর। শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য এখন যেমন তুঙ্গে আছে, এর চেয়ে কম থাকলে নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক খিঁচ দেশলাইয়ের কাঠির মত ভেঙে দিত ওর মেরুদণ্ডটা। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল। বাহু বেয়েও গড়াচ্ছে।

শোকরানের অকারণ হাসি একটা অসহ্য অত্যাচার। বিশেষ

করে কথা বলার আগে ও পরে তাকে যেন হাসতেই হবে। 'এ কিছুই না বঙ্গালী বাবু, স্রেফ টেস্ট করছি—ওয়ান, টু, থ্রী—হি-হি-হি...'

আবার সেই প্রচণ্ড ঝাঁকি, শরীরের ভেতর সমস্ত কলকব্জা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলে গেছে, কিন্তু ব্রেন সেলগুলো কোন রকম আওয়াজ তৈরি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।

ভোল্টেজের দ্বিতীয় ডোজ সামলে নেয়ার পর শোকরানকে রানা বলল, 'মাত্রা ছাড়িয়ো না, বুঝলে। আমি মারা গেলে কাকে তুমি গান গাওয়াবে?'

সহজবোধ্য যুক্তিটায় শোকরানের মন সায় দিতে তার উৎসাহে একটু ভাটা পড়ল। পরবর্তী কয়েক মিনিট কয়েকটা ইলেকট্রোড-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সংখ্যায় কম, কিন্তু সময়ের হিসেবে দীর্ঘক্ষণ কারেন্ট খাওয়াল সে রানাকে। একবার করে খাওয়ায়, থেমে কাছে সরে এসে ভাল করে দেখে রানাকে, কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করে।

চমকপ্রদ কিছু বলে কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষ বিকৃত মস্তিষ্ক শোকরান হওয়ায় উৎসাহবোধ করছে না রানা। তাছাড়া, বারবার কারেন্ট খেয়ে শরীরটা অকেজো হয়ে আসছে। ও ভয় পাচ্ছে, শরীরের আগে ব্রেনটাই না অচল হয়ে যায়।

শোকরানের হাসিতে নতুন একটা সুর যোগ হওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেল রানা। অনুভব করল ইলেকট্রোডগুলো শরীর থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে। এরপর শোকরান মাত্র দুটো ইলেকট্রোড আটকাল ওর উরুসন্ধিতে। সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশে ঠাণ্ডা ধাতবের স্পর্শ ব্রেনে জরুরী বার্তা পাঠালঃ সারা শরীরে কিন্তু গজব নেমে আসছে!

নিজেকে মুক্ত করার উপায় একটা নিশ্চয়ই আছে। বিখ্যাত

জাদুকরদের কলা-কৌশল প্রচুর সময় নিয়ে স্টাডি করেছে ও। সেগুলোর কোন একটা কাজে লাগানো যায় না? মুশকিল হলো, টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখায় নিজের পেশির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

'হি-হি-হি,' হাসছে শোকরান। 'একটু অপেক্ষা করেন, বঙ্গালী বাবু। এই গেলাম আর এলাম।'

রানা ভাবল, এখানে তোমার নেইটা কি? শুনতে পেল পায়ের থপ্-থপ্ আওয়াজ কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এ যেন না চাইতেই বৃষ্টি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করল রানা, ওর উরুসন্ধিতে আটকানো একটা ইলেকট্রোড-এর তার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা ওর হাতের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেছে। চামড়ার স্ট্র্যাপের ভেতর হাত মোচড়াতে শুরু করল, একচুল একচুল করে এগিয়ে তারের নাগাল পেতে চাইছে আঙুলগুলো।

আঙুলের ডগা তারটাকে স্পর্শ করল। কিন্তু ছোঁয়া এক কথা, নিয়ন্ত্রণে আনতে পারা সম্পূর্ণ অন্য কথা। এদিকে স্ট্র্যাপের চামড়া কব্জিতে ছুরির ফলার মত গেঁথে যাচ্ছে। রানার ভয় হচ্ছে হাড়টা না ভেঙে যায়। তারপর মধ্যমা আঙুলের ডগা তারটার ওপর উঠে এলো। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, আঙুলে ওটাকে জড়াচ্ছে ও। তারপর হ্যাঁচকা এক টান দিল, অনুভব করল টেপের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো ইলেকট্রোডটা।

আঙুলে আরও জড়িয়ে তারটাকে টান টান করল রানা, আরেক টানে জেনারেটিং মেশিন থেকে খুলে ফেলল। তারটা দিয়ে একটা লূপ বানাল, লূপটা স্ট্র্যাপ-এর ওপর ঘোরাফেরা করল কয়েক সেকেন্ড। স্ট্র্যাপে তালা দেয়া নেই, আঙটা দিয়ে আটকানো। তবে ওগুলো যথেষ্ট দূরে, হাত বাড়ালেও নাগাল পাবে না 'রোগীরা'।

তারটাকে ঠিক বড়শির আকৃতিতে বাঁকাল রানা, স্ট্র্যাপের শেষ প্রান্তে ঢুকিয়ে টান দিতেই খুলে গেল আঙটা।

কাজটা তখনও শেষ হয়নি, থপ-থপ পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। তাড়াতাড়ি দেখে নিল স্ট্র্যাপটা পুরোপুরি খুলেছে কিনা। ইলেকট্রোডটাও আগের জায়গা মত আটকে রাখতে হলো। ইতিমধ্যে শোকরান কামরার ভেতর ঢুকে পড়েছে; তবে সে ব্যস্ত, রানার দিকে তাকাচ্ছে না।

চাকা লাগানো আরেকটা অপারেটিং টেবিল নিয়ে শোকরান কামরায় ফিরছে। টেবিলের ওপর নিরাবরণ শুয়ে রয়েছে লুসিন্ডা লাজুলি, মানে, তার যতটুকু অবশিষ্ট আছে। একবার তাকিয়ে মুখটা আরেক দিকে ফিরিয়ে নিল রানা। লাজুলির লম্বা হলুদ একরাশ চুলে রক্ত আর ধুলো লেগে রয়েছে। মুখ দেখে কেউ এখন চিনবে না। হাত দুটো ঝুলছে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যে পবিত্র ও অমূল্য সম্পদ রানা ছাড়া আর কেউ দেখেনি, লাজুলির সেই সুন্দর শরীরটায় এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যেখানে কোন ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন নেই। ফুলে ওঠা লম্বা দাগগুলো কিভাবে হলো? চাবুক মারা হয়েছে?

এখনও ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। গলার অনেক ভেতরে কিছু শব্দও হচ্ছে। রানা কি ভুল শুনল? এক সময় কণ্ঠনালী ছিল, এখন শুধুই থেঁতলানো মাংস আর গুঁড়ো গুঁড়ো হাড়, সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শব্দটা। ইচ্ছে করছে না, তবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে হবে। সত্যি কি ওকে ডাকল লাজুলি? সে কি তাকিয়ে আছে? রানা কি বিশ্বাস করবে, লাজুলির চোখে দৃষ্টি আছে, দেখতে পাচ্ছে সে?

ধীরে ধীরে আবার ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল ওকেই দেখছে লাজুলি। বলল, 'হ্যালো, লাভ,' যতটা পারল হালকা সুরে, 'আগে শোকরানটাকে মেরে নিই, তারপর দশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পৌঁছে যাব হাসপাতালে।'

কি যেন বলল লাজুলি। রানা শুনতে পায়নি। বাক্যটার শেষ অংশ–'হলো না।'

'কি বলছ হলো না! আমি তো আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, শুধু তোমাকে বলা হয়নি। অফ কোর্স আমরা বিয়ে করছি! হলো না মানে? হতেই হবে! সেরে উঠতে খুব বেশি হলে এক হপ্তা, তারপরই তো সেই আগের মত...'

'তুমি কাঁদছ...'

লাজুলির কথা কানে যেতে বোবা হয়ে গেল রানা। অনুভব করল, সত্যি কাঁদছে–চোখ ফেটে পানি গড়াচ্ছে। প্রাণের দায়ে, জান বাঁচানো যখন ফরজ, অভিনয় করতে অসুবিধে হয় না; কিন্তু অসম্ভব ভাল লাগায় যাকে নিজের একটা অংশ বলে মনে হয় তাকে শেষ অবস্থায় মিথ্যে আশ্বাস দিতে হলে অভিনয়ে ত্রুটি থাকবেই।

শোকরানকে আবার হাসতে শুনল রানা।

'প্রেমিক আর প্রেমিকা আবার পরস্পরকে দেখার সুযোগ পেল,' বলল সে। 'শোকরান এখন ওদেরকে দৈহিকভাবে মিলিত হতে বাধ্য করবে। তবে আগের কাজ আগে। ইন্টারোগেশন।'

লাজুলির টেবিলটা ঠেলে রানার টেবিলের পাশে নিয়ে এলো শোকরান। এরপর রানার শরীরের যে-সব জায়গায় ইলেকট্রোড বসিয়েছে, লাজুলির শরীরেও ওই একই জায়গায় ইলেকট্রোড বসাল, তারপর সেট জোড়াকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করল।

'বঙ্গালী বাবু, আপনি যদি জবাব না দেন তাহলে ইলেকট্রিকের মার খাবেন। মিয়া-বিবিকে ডান্স করতে দেখব আমি।' ঘুরে মেশিনটার কাছে যাচ্ছে। এখুনি দেখতে পাবে, রানার তার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। 'শেষবার জানতে চাইছি...'

ওটাই ছিল শোকরানের শেষ কথা। সাপের মত ছোবল মারল রানার হাত, আঙুলগুলো বেল্ট আর পেটের মাঝখানে সেঁধিয়ে গেল। একটু পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল শোকরান, বুঝতেই পারেনি কি ঘটতে যাচ্ছে। তাকে হ্যাঁচকা টানে দড়াম করে টেবিলে এনে ফেলল রানা. বেল্ট ছেড়ে দিয়েছে আগেই, এবার প্রচণ্ড এক জুডো

চপ্ কষাল ওর উইন্ড-পাইপের ওপর। 'ঘ্যাক' করে বিকট একটা আওয়াজ বের হলো শোকরানের গলা দিয়ে। সামলে নেয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে রানা প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল এবার ওর গলাটা। চাপ বাড়াল ধীরে ধীরে, লোকে যেভাবে এক্সারসাইজ বল-এ চাপ দেয়, আঙুলগুলো লোহার আঙটার মত নরম গলায় বসে যাচ্ছে।

রানা প্রফেশন্যাল। ফ্রান্সে আসার পর অনেক কিছুই ঘটেছে, কিন্তু ওর রাগ হয়নি; রাগ হয়েছে এখানে, দ্বিতীয়বার ওয়াসিম মালিকের শ্যাতোয় আসার পর। লাজুলি সব কিছু বদলে দিয়েছে। শোকরানের ভারী শরীর শিথিল হয়ে আসছে। বাহু আর কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে গলাটা টিপে ধরল রানা, যতক্ষণ না লোকটার গলার থলথলে চর্বির ভেতর ডুবে গেল কব্জি পর্যন্ত পুরো হাতটা। একসময় বুঝতে পারল ও, মারা গেছে শোকরান।

অপর হাতটা মুক্ত করে কয়েক সেকেন্ড ডলল রানা, তারপর লাজুলির পাশে চলে এলো। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর চোখ জোড়া একবার খুলল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। হাসির সঙ্গে মেলে এরকম একটা ভাব দেখা দিল তার ঠোঁটে। যেন অনন্তকাল চেষ্টা করার পর ওর বাহুতে একটা হাত রাখতে পারল সে।

'তুমি পেরেছ। তুমি সব সময় পারো। কিন্তু ওই বেচারিরা যারা তোমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায়...' সুস্থ থাকলে ভঙ্গিটাকে শ্রাগ বলা যেত, এই মুহূর্তে শুধু কাঁধটা একটু কাঁপল। 'আমি ওই বেচারিদের দলে। চেয়েছিলাম, খুবই চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলব...'

কাঁদবে না বলে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেও, নিজেও জানে না চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে, রানা ভাঙা গলায় বলল, 'দুনিয়ায় এতসব পাপ, সেজন্যে তুমি ক্ষমা করো আমাদের। লক্ষ্মীটি, আর একটু সহ্য করো, এখুনি আমি ডাক্তার ডাকছি...'

'না—ক্ষমাও চেয়ো না, দুঃখও পেয়ো না,' বিড় বিড় করে

বলল লাজুলি। 'সময়টা অল্পই ছিল, তবে তোমার সান্নিধ্যে সত্যি স্বর্গসুখই পেয়েছি আমি...'

'ডাক্তারকে একটা ফোন করে এখুনি ফিরে আসছি আমি।' রানা জানে, কোন আশা নেই। লাজুলির শরীরের তাপ অস্বাভাবিক কমে গেছে। শ্বাস প্রায় নিতেই পারছে না।

'মেয়েটা মালিকের কাছে, জানো তো?'

'জানি,' বলল রানা। 'তাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব।'

'সে ওকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। জায়গাটার নাম... বিয়ারিজ...ভিলা সান সাউসি...,' আবার কি ক্ষীণ হাসির আভাস লাজুলির ঠোঁটে। ইংরেজিতে ভিলা সান সাউসির মানে দাঁড়ায়–ভিলা উইদাউট কেয়ার।

'বেচারি বার্নিকে ওরা মেরে ফেলল...সে ওদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা না করলেও পারত...'

লাজুলির শুধু ঠোঁট নড়ছে, তার বেশিরভাগ কথাই রানা শুনতে পাচ্ছে না; আন্দাজে বুঝতে চেষ্টা করছে কি বলতে চায়। 'আঙটিটা?' বন্ধ চোখের পাতায় চুমো খেলো রানা।

'ও, হ্যাঁ,' লাজুলির গলা এত দুর্বল, কোন রকমে শুনতে পেল রানা। 'পরে আছি। আমার আঙুলে।'

এত দুর্বল যে হাতটা তুলতে পারল না। বেদুইন কারিগরের তৈরি, খুব একটা সুন্দর নয় আঙটিটা। এটার কোন তাৎপর্য থাকতে পারে, পাকিস্তানীরা জানতই না। আরেকবার চুমো খেলো রানা, এবার রক্তভেজা কপালে। তারপর পাশের কামরায় এসে ডাক্তারকে ফোন করল। একটু পরেই লাজুলির কাছে ফিরে এসে দেখল সে মারা গেছে।

এগারো

একটা চাদর দিয়ে লাজুলিকে ঢেকে ওখানেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, মনটা আবেগে এত অস্থির যে নড়াচড়া করার সাহস পর্যন্ত যেন হারিয়ে ফেলেছে। প্রায় মিনিট দুয়েক পর কাপড় পরল। ওর ওয়াল্থার আর ছুরিটা পড়ে রয়েছে ওয়াসিম মালিকের চেয়ারের পাশে।

রফিককে ফোন করল রানা।

'আমাকে ক্ষমা করুন, মাসুদ ভাই,' রানার গলা পেয়েই শুরু করল সে।

'থামো তো,' ধমক দিল রানা। 'ওটা একটা ওয়েলপ্ল্যান্ড্ অ্যামবুশ ছিল। তাছাড়া ব্যর্থতা থেকেই শিখতে হয়। বেঁচে থেকে দুঃখ প্রকাশ করতে পারছ স্রেফ ভাগ্যগুণে। এবার শোনো।' দ্রুত, সংক্ষেপে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে একটা ট্রাক দেখতে পেল রানা, লোকজন জিনিস-পত্র তুলছে পিছনে। দু'একজন অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাচ্ছে এদিকে, লক্ষ করল ও। তারমানে, শোকরানের জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।

গোটা বাড়ি খুঁজতে হলো না, পাশের ঘরেই বেশ বড় একট ট্রাঙ্ক পেয়ে গেল রানা। শোকরানের লাশটা ওটায় ভরে তালা দিল ট্রাঙ্কে, চাবিটা পকেটে ফেলল।

ট্রাঙ্কটা টেনে বাইরে নিয়ে এলো রানা। দেখল কাজ শেষ করে

ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো। 'এটাও যাবে,' বলল ও।

এক লোক চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'মোটা লোকটা কোথায়?'

শ্রাগ করল রানা, 'বেশ কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে সে। আমার ওপর হুকুম ছিল, এটায় মালপত্তর ভরা শেষ হলে তোমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।' আরেকবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাড়ির ভেতর ফিরে এলো। ট্রাকটা চলে যেতে আবার বেরুল, লনের ওপর দিয়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকল। গাড়িটা জায়গা মতই পেল ও।

কয়েক ঘণ্টা পর সেফহাউসে বসে বস্ আর সোহেলের সঙ্গে টেলি-কনফারেন্সে কথা বলল রানা। রাহাত খান রয়েছেন ঢাকায়। সোহেল রয়েছে ফ্রান্সে।

কি কি ঘটেছে রানার মুখ থেকে শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে কোন মন্তব্য না করে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছলেন রাহাত খান।

'একটা চার্টার করা প্লেন নিয়ে,' বলল রানা, ওর পরবর্তী প্ল্যান ব্যাখ্যা করছে, 'মালিকের আগে বিয়ারিজ-এ পৌঁছাতে চাই আমি।'

'না।' চোখে চশমা পরে বললেন বস্। 'ওখানে নয়, তোমাকে আমি আরেক জায়গায় পাঠাচ্ছি।'

'সার?'

'গতবারই তোমাকে বলেছি, পাকিস্তানে দ্রুত বদলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর জন্যে যে এস্কেপ রুটটা তৈরি করা হয়েছে সেটার নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ আছে, তারপর আর ওই রুট কাজে লাগানো যাবে না। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? তাঁকে যদি এখুনি আমরা বের করে আনতে না পারি, পরে হয়তো চেষ্টাই করা যাবে না। এখন আমরা জানি তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে, কিন্তু সরিয়ে ফেললে? তাছাড়া, সরকারের ওপর মহলের একটা অংশ বলছে, প্রফেসর চৌধুরী আবার পালাবার

চেষ্টা করার আগে তাঁকে মেরে ফেলাই ভাল। কাজেই তুমি পাকিস্তানে যাচ্ছ, রানা।'

রানা কিছু বলছে না। জীবনে বোধহয় এই প্রথম বলবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না ও। 'ইয়েস, স্যার,' অবশেষে এটুকু বলাই শ্রেয় মনে হলো।

'ভেবো না হঠাৎ তোমাকে যেতে বলা হচ্ছে,' বললেন রাহাত খান। 'এই অ্যাসাইনমেন্টের পিছনে বহু শ্রম, সময় ও টাকা ঢেলেছি আমরা। ওখানে পৌঁছে তুমি অসহায় বোধ করবে না। এ-কথা সত্যি, এমন এক জায়গায় পাঠানো হচ্ছে তোমাকে, এর আগে যেখানে কেউ যেতে পারেনি, বা গেলেও ফিরে আসতে পারেনি। কিন্তু আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি, তুমি যাবে, প্রফেসরকে নিয়ে ফিরেও আসবে। কাজটা তোমাকে একাই করতে হবে। তবে অন্তত কিছু লোক ওখানে থাকবে যারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, অসম্ভব না হলে সাহায্যও করবে। সোহেল তোমাকে ডিটেইলস জানাবে।'

'কিন্তু, স্যার, মেয়েটার কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'প্রফেসর চৌধুরী কি বাংলাদেশে পৌঁছে গবেষণা করতে চাইবেন, মেয়েকে যদি ফিরে না পান?'

'মেয়েটাও বাংলাদেশে আসবে। তুমিই চিন্তা কোরো না, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'বিয়ারিজ-এ লুকিয়ে আছে ওয়াসিম মালিক। আমরা তাকে খুঁজে পেয়েছি, আমাদের তিরিশজন এজেন্ট ঘিরে রেখেছে বাড়িটা। তৃষাকে নিয়ে সে পালাতে পারছে না। আমাদের এজেন্টরা তো বটেই, ফ্রেঞ্চ আর স্প্যানিশ পুলিসও রাতদিন তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তৃষার কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না, কারণ তাহলে দর কষার কিছু থাকে না ওর হাতে। তবে প্রফেসরকে ওরা খুন করতে পারে, তারপর মারতে পারে তাঁর মেয়েকে। এটা ঠেকাতেই যাচ্ছ তুমি, এবং ফিরে এসে সারবে বাকি কাজটুকু।'

কথা না বলে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সোহেলের কাছ থেকে অপারেশনের ডিটেইলস জেনে নাও। গুডলাক, মাই সান।' টিভি মনিটর থেকে বিসিআই চীফ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

'জায়গাটার নাম জিয়ারত, শুনেছিস?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'না।' মাথা নাড়ল রানা।

প্রথমে দীর্ঘ ভৌগোলিক বর্ণনা দিল সোহেল। 'বেলুচিস্তান প্রদেশের বড় শহর কোয়েটা থেকে জিয়ারত একশো তেত্রিশ কিলোমিটার দূরে, সী লেভেল থেকে আট হাজার দুশো ফুট ওপরে। জিয়ারত সিবি জেলার একটা ছোট্ট শহর, সংলগ্ন উপত্যকায় জুনিপার বাগান থাকায় শহরটাকে ইংরেজরা জুনিপার শহর বলত।

'জিয়ারত থেকে আট কিলোমিটার দূরে বাবা খারওয়ারির সমাধি আছে। তিনি সারাং জাই গোত্রের লোক ছিলেন, নাম ছিল তাহির। এক সময় তিনি নানা সাহেব-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং জনশ্রুতি আছে নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রতি বছর এই সময়টায় দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর সমাধিতে সারাং জাই গোত্রের লোকেরা আসে। একটা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

'এবার ওই উৎসবে প্রফেসর চৌধুরীর শ্বশুর মুরাদ খাজাইও আসবেন। কারণ সারাং জাই গোত্রের ওই সর্দারের মেয়েকেই প্রফেসর বিয়ে করেছেন...'

তারাগুলো মুক্তোর মত জ্বলজ্বল করছে, মনে হলো এত কাছে যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। গতির পরিবর্তন অনুভব করে রানা বুঝতে পারল প্লেন নিচে নামছে। একমুহূর্ত পর ইন্টারকমে

পাইলটের গলা ভেসে এলো, 'ড্রপ এরিয়ায় চলে আসছি, সার। স্ট্যান্ড বাই, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ।'

'রাতটা বিশেষ ভাল নয়, স্যার,' বলল পাইলট সাত্তার বুরুজ। প্লেনটা চার্টার করা হলেও, এই আফগান পাইলট রানা এজেন্সির কাবুল শাখার একজন অপারেটর। 'মেঘ নেই, চাঁদটাও বড়। তবে বাতাস কম।' কৌতূহলে মরে যাচ্ছে সে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস নেই কেন কোথায় যাচ্ছে রানা।

জিয়ারত থেকে বেশি দূরে নয়, তবে ক্রমশ উঁচু সারি সারি পাথুরে পাহাড় আর গভীর সব গিরিখাদের মাঝখানে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত সমতল একটা জায়গা আছে, নাম 'চাশমা ওয়াক'। সারাং জাই গোত্রের সর্দার তাঁর লোকজন নিয়ে এই চাশমা ওয়াকেই কোথাও অপেক্ষা করবেন।

চাশমা ওয়াক থেকে একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে পাকিস্তানের অতি গোপনীয় বায়োলজি ল্যাব। এখানে মানুষ মারার জীবাণু তৈরি করা হয়। গোটা জায়গাটা প্রায় একটা ক্যান্টনমেন্টের মতই দুর্ভেদ্য করে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে।

অক্সিজেন মাস্ক চেক করল রানা। পনেরো থেকে উল্টোভাবে গুনছে পাইলট–কাউন্টডাউন। 'চার···তিন···দুই···এক···'

খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিল রানা।

প্যারাশুট ঠিকমতই খুলল। পা পড়ার পর রানা বুঝল চাশমা ওয়াক-এর মেঝেতে নরম বালিও আছে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছিল, এক লাফে সিধে হলো। এখন সবকিছু নির্ভর করছে সারাং জাই সর্দার মুরাদ খাজাই-এর ওপর। সোহেলের ভাষ্য অনুসারে প্রফেসরের স্ত্রী সব সময়ই স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর বাবা সর্দার মুরাদ খাজাই আর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সম্প্রদায়ের একটা মেয়েকে ভিন দেশে পাঠাতে এতদিন একদমই রাজি হননি। এ-

ব্যাপারে প্রফেসর চৌধুরীর নিজস্ব কোন আলাদা মতামত ছিল বলে মনে হয় না। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে ভালবাসেন, তারা যেখানে থাকতে চায় সেখানেই থাকবে, তাতে তাঁর আপত্তির কিছু নেই, যতদিন না তাঁর গবেষণার কাজে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

পাকিস্তান সরকার যখন ধানখেত ধ্বংস করার বীজটা তাকে আগে তৈরি করতে বলল, তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে স্বভাবতই আর কারও বাকি থাকল না। সর্দার মুরাদ খাজাই এবার নিজেই মেয়ে-জামাই আর নাতনীকে বাংলাদেশে চলে যাবার অনুমতি দিলেন। বিসিআই এ-খবর জানার পর সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে। রানা এখানে নামার আগে, গতকাল রাতে, আরও একটা প্লেন চাশমা ওয়াকের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে, যাবার সময় ফেলে গেছে পাঁচটা কাঠের বাক্স। বাক্সগুলো হেলে দুলে নেমে এসেছে প্যারাশুটের সাহায্যে।

সেই পাঁচটা বাক্স এখন সারাং জাই গোত্রের লোকেদের অস্থায়ী তাঁবুতে থাকার কথা। ওগুলো না পেলে পাকিস্তানীদের বায়োলজি ল্যাব এলাকায় গিয়ে প্রফেসর ফারুক চৌধুরীকে নিয়ে আসা রানার পক্ষে সম্ভব হবে না।

চাশমা ওয়াক এক মাইল লম্বা। পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটেও সারাং জাইদের কোন তাঁবু রানার চোখে পড়ল না। শেষ প্রান্ত থেকে ফিরে আসবে, এই সময় চাঁদের আলোয় গিরিখাদের ভেতর আগুন জ্বলতে দেখল রানা। ওরা কারা জানা নেই, প্রায় দেড় মাইল দূর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। পাকিস্তানীদের সাময়িক চৌকিও হতে পারে। তবে জানতে হলে ঢাল বেয়ে নামতেই হবে রানাকে।

ঢাল বেয়ে নেমে এলো ও। ইতিমধ্যে জ্বলন্ত মশাল নেড়ে সংকেত দেয়া হয়েছে ওকে। তাঁবুগুলোর কাছাকাছি আসতে আগুনের পাশ থেকে বৃদ্ধ এক লোক উঠে দাঁড়াল। 'মুবারক হো জনাব কা নাম মাসুদ রানা, জ্বী?'

'সার্দার মুরাদ খাজাই?'

এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করলেন সর্দার খাজাই। রানা লক্ষ করল, সর্দারের সঙ্গীরা যে যার রাইফেল এতক্ষণে নামিয়ে নিল। বাক্সগুলোর কথা জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা, তবে কোন প্রশ্ন করার আগেই সর্দার খাজাই বললেন, 'কোন কথা না, আগে খানা খেয়ে নিন, জনাব।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে সর্দার খাজাই বললেন, 'বাক্সগুলোয় কি আছে আমি জানি না। সব মিলিয়ে পাঁচটা বাক্স। আমাকে বলা হয়েছে এই বাক্সগুলো জনাব মাসুদ রানা পেলে তিনি আমার জামাইকে পাকিস্তানীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে পারবেন। জনাব, তা কি করে হয়? ওগুলো কি জাদুর বাক্স?'

'আপনি ওদেরকে পাকিস্তানী বলছেন, তাহলে আপনারা কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা সারাং জাই, জনাব,' গর্বের সুরে বললেন সর্দার খাজাই। 'আমাদের কোন দেশ নেই; গোটা বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান–সব দেশই আমাদের দেশ। সবাই আমাদের বন্ধু। দুশমন শুধু পাকিস্তান।'

'কেন?'

'সে অনেক লম্বা ইতিহাস, জনাব,' বললেন সর্দার। 'সারাং জাইরা সবাই মুসলমান নয়–আমাদের মধ্যে খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, শিখ, পারসী আর মুসলিম–সব ধর্মের লোক আছে। কিন্তু পাকিস্তানের সব সরকারই কেবল মুসলমানদের স্বার্থ দেখে। আমাদের সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলো একে একে বেদখল হয়ে যাচ্ছে...'

সর্দারকে রানা বলল, 'একটা প্রশ্নের জবাব পেলাম। একটু আগে আপনি বললেন আপনার জামাইকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। কারাগার বলছেন কেন?'

'কারাগার বলাটা ভুল হয়েছে, জনাব।' সর্দার গম্ভীর। 'জায়গাটা আসলে দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য সামরিক ঘাঁটি।

আসুন, জনাব, আপনার মাল-সামান আপনি খুঝে নিন।'

সর্দারের পিছু নিয়ে উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা ওঠার পর শুকনো একটা অগভীর নালা দেখল রানা। সেমি অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে কয়েকজন এদিকটায় টহল দিচ্ছে। সর্দার খাজাই হাত তুলে প্রকাণ্ড আকারের পাঁচটা প্যারাক্রেইট দেখালেন রানাকে।

'জনাব, বলবেন কি, এগুলোর ভেতর কি আছে?' বৃদ্ধ সর্দারের কৌতূহল এই মুহূর্তে তুঙ্গে।

রানা হাসল। 'বললে তো বিশ্বাস করবেন না। তারচেয়ে নিজের চোখেই নাহয় দেখবেন কি আছে।'

'বেশ, তাই দেখব। এবার জানান, আপনাকে আমরা আর কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

'পাকিস্তানীদের নিষিদ্ধ বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি এলাকায় আমি একাই যাব,' বলল রানা। 'প্রফেসর চৌধুরীকে নিয়ে যদি ফিরে আসতে পারি, আপনারা শুধু পথ দেখিয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছে দেবেন আমাদেরকে।'

'আল্লাহ মেহেরবান,' বললেন সর্দার। 'সেটা কোন সমস্যাই নয়। আপনাদেরকে সারাং জাই সাজিয়ে কাবুল পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেব, কোন চিন্তা করবেন না।'

'মিসেস ফারুক হাসান, আপনার মেয়ে। উনি তো আপনাদের তাঁবুতেই আছেন, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি কি ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি?'

সর্দার মাথা নাড়লেন। 'মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তাকে আমরা জিয়ারতে বা চাশমা ওয়াক-এ আনিনি, জনাব। তাকে অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে জামাই বাবাজীকে নিয়ে আপনি ফিরে আসুন, সীমান্ত পেরুবার আগেই তাকে আমাদের কাফেলায় আপনি দেখতে পাবেন।'

রানাকে ওর তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হলো। ঠিক হলো, সর্দারের

লোকজন খুব ভোরে বাক্সগুলো ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় নিয়ে গিয়ে রাখবে।

ভালই ঘুম হলো রানার। সকালে আটার রুটি, মাখন, কবুতরের ডিম আর পাহাড়ী ছাগলের ঘন দুধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল। সর্দারের সঙ্গে ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে দেখল পাঁচটা বাক্সই খুলে ফেলেছে অতি উৎসাহী তরুণরা। পাঁচ ভাগে ভাগ করা, খোলা একটা হেলিকপ্টার; নিয়মটা জানা থাকায় তরুণদের সাহায্যে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টার মধ্যে জোড়া লাগিয়ে ফেলবে রানা। জিনিসটা আসলে কি বুঝতে পেরে তরুণদের উল্লাস দেখার মতই হলো। তারা কল্পনাও করতে পারেনি বাক্সগুলোর ভেতর এ-ধরনের কিছু একটা থাকতে পারে। বুড়ো বয়েসে মানানসই নয়, তা সত্ত্বেও তরুণদের সঙ্গে সর্দার নিজেও কিছুক্ষণ নাচানাচি করল।

মাঝখানে খাওয়াদাওয়া ও দু'তিনবার বিশ্রাম নেয়ায় কাজটা শেষ করতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। বিসিআই-এর সংগ্রহ করা এটা একটা নতুন স্পোর্টস মডেল হেলিকপ্টার, তৈরি করা হয়েছে সিভিলিয়ান পাইলটের জন্যে–হালকা, সহজে জোড়া লাগানো যায়, প্রায় কোন শব্দ করে না, এবং সবচেয়ে বড় গুণ কোন রাডারে ধরা পড়বে না।

সর্দার খাজাই জানতে চাইলেন, 'আপনার অস্ত্র আছে তো?'

'অস্ত্র ব্যবহার করতে হলে,' বলল রানা, 'মিশন বোধহয় ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

সর্দার গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পর বললেন, 'চাশমা ওয়াক-এর এত কাছে তাঁবু ফেলেছি, আমরা এখানে মোটেও নিরাপদ নই। সূর্য ওঠার পরপরই এই জায়গা ছেড়ে রওনা হয়ে যাব আমরা। আপনার হেলিকপ্টার যদি দেখে ফেলে, গোটা এলাকায় ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত পাকিস্তানী সৈন্য ছুটে আসবে। একটু আগে রওনা হলে গিরিখাদের গভীরে ওরা আমাদেরকে

খুঁজে পাবে না। কিন্তু রওনা হতে দেরি করলে ফাঁকা জায়গায় পেয়ে যাবে...'

'আমি সূর্য ওঠার আগেই ফিরে আসব,' বলল রানা, গম্ভীর। 'তা না হলে কোনদিনই ফিরব না।'

পাঁচ মিনিট পর অন্ধকার পাহাড়ের মাথা থেকে স্টার্ট নিয়ে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। অবশ্য টেস্ট করার জন্যে এর আগেই একবার সর্দারকে পাশে নিয়ে দশ মিনিট উড়েছে রানা।

সঙ্গে ম্যাপ আছে, কোর্স সেট করতে কোন অসুবিধে হলো না। পাহাড় ও গিরিখাদ পিছনে ফেলে মরু এলাকার ওপর চলে এলো কপ্টার। রাডারকে নয়, ফাঁকি দিতে হবে মানুষের চোখকে, তাই অন্ধকার আকাশের যতটা সম্ভব ওপরে থাকল রানা।

ম্যাপে যে ফ্লাইট পাথ বিসিআই এক্সপার্টরা চিহ্নিত করে দিয়েছে সেটা ধরেই যাচ্ছে রানা। এই পথ ধরে ল্যাব কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগবে ওর।

ঠিক দু'ঘণ্টা পর ল্যাব কমপ্লেক্সের আলো দেখতে পেল রানা। পরবর্তী কয়েক মিনিট সোহেলের কাছ থেকে পাওয়া অ্যাপ্রোচ ইন্সট্রাকশন অনুসরণে ব্যস্ত থাকল। আট মিনিটের জন্যে টোয়েনটিফাইভ পারসেন্ট পাওয়ার কাটব্যাক...নিচে নামতে হবে প্রতি মিনিটে কাঁটায় কাঁটায় দুশো ফুট করে বিরতিহীন দশ মিনিট...অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং দেখতে পেলে একশো চল্লিশ ডিগ্রী ঘুরে যাবে...

রানার নিয়ন্ত্রিত হাত কন্ট্রোলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা-সেটা অ্যাডজাস্ট করার ফাঁকে হিসাব করছে শেষ নামাটা কখন নামবে। রোলেক্সের আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল একবার, শেষবারের মত আরেকটা বাঁক ঘুরছে। হঠাৎ সুইচ অফ করে দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিল ও। মোটর ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেমন যেন অলৌকিক লাগছে. এরকম অভিজ্ঞতা আগে

কখনও হয়নি রানার, ভূতের মত নিঃশব্দে নিচে নামছে আকাশ থেকে। নিচের কোথাও থেকে কোন সার্চলাইট জ্বলল না। কোন গানারও মেশিন গান চালাচ্ছে না। প্রকাণ্ড একটা বাজপাখির মত কাঁটাতারের বেড়ার অনেক ওপর দিয়ে উড়ে নিষিদ্ধ ল্যাব এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়ল কপ্টার। ওর নিচে এখন বিস্তৃত খেত—এক্সপেরিমেন্টাল রাইস ফিল্ড, এই ধানখেত নিয়েই গবেষণা চালান প্রফেসর ফারুক চৌধুরী। রাহাত খান, তুমি একটা বিরল প্রতিভা, হে!—সকৌতুকে ভাবছে রানা, হাজার মাইল দূরের একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে গলগল করে হাভানা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে হিসেব করে দিয়েছ ঠিক কোথায় বাঁক নিয়ে কোন্ তির্যক পথ ধরে নিচে নামতে হবে! কপ্টার ভেজা ভেজা ধানখেতে শান্তভাবে নামল, প্রায় কোন শব্দই হলো না। পাইলটের সিটে এক মুহূর্ত বসে থাকল রানা। সামান্য যে শব্দ হয়েছে ধানখেতের ওপর ক্যানভাসের শামিয়ানা থাকায়। ক্যানভাসের এই শামিয়ানা মরু এলাকার রোদ থেকে ধানগাছগুলোকে রক্ষার জন্যে টাঙানো হয়েছে। খানিকটা ক্যানভাস ছিঁড়ে গেছে, তবে শব্দটা বেশি দূর গেছে বলে মনে হয় না। অবশ্য আশপাশে কোন গার্ড থাকলে ঠিকই শুনতে পেত। তারা সবাই সম্ভবত বেড়ার দিকে টহল দিচ্ছে।

কপ্টার থেকে নেমে খুব সাবধানে এগোল রানা। তবে একটু পরেই বুঝতে পারল আশপাশে সত্যি কেউ নেই। আইল ধরে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছে এখন।

ধানখেত থেকে বেরিয়ে এলো রানা। এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায়, এভাবে সাবধানে এগোচ্ছে। সব কিছু বড় বেশি সহজে ঘটে যাচ্ছে। নকশা দেখা আছে, প্রফেসর ফারুক চৌধুরীর কোয়ার্টারটা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। পাঁচ কামরার ছোট একটা বাড়ি। প্রফেসর ফারুক চৌধুরীই এখানকার প্রজেক্ট ডিরেক্টর। বাড়িটায় এখন তিনি একাই থাকেন। দ্রুত সামনে

এগোল রানা।

দরজায় তালা দেয়া নেই। রানাকে বলাও হেয়েছে, থাকবে না। ভেতরে ঢুকে টর্চ জ্বালল রানা। ড্রইংরুমে ঢুকেছে ও। ফার্নিচার কম, তবে র‍্যাকে, শেলফে, টেবিলে, এমনকি কার্পেটের ওপরও অসংখ্য বই দেখা যাচ্ছে।

বেডরুমে আলো জ্বলছে। খোলা দরজা দিয়ে স্লীপিং গাউন পরা প্রফেসর ফারুক চৌধুরীকে দেখতে পেল রানা, হাতে পাইপ নিয়ে মেঝেতে পায়চারি করছেন, কপালে চিন্তার রেখা।

'এক্সকিউজ মি,' দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল রানা। 'প্রফেসর ফারুক চৌধুরী?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে না। 'আমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশ থেকে আপনাকে নিতে এসেছি।'

পায়চারি আগেই থেমে গেছে, চশমার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন প্রফেসর ফারুক চৌধুরী। 'আমি আশা করেছিলাম আপনি আরও আগে পৌঁছবেন। এনি আইডেনটিটি?'

পকেট থেকে নিজের পরিচয়-পত্রটা বের করে বাড়িয়ে ধরল রানা।

সেটায় একবার শুধু চোখ বুলালেন প্রফেসর, ছুঁলেন না। 'আমার মেয়ের চিঠি?'

'দরজা খোলা,' বলল রানা। 'আমাদের সাবধান হওয়া উচিত নয়?'

প্রফেসর হাসলেন। ইঙ্গিতে হাতঘড়িটা দেখালেন রানাকে। 'আপনি যখন বাড়ির ভেতর ঢুকলেন, এই ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজেছিল। বলতে চাইছি, বাইরে কিছু ইলেকট্রনিক সেনসর ছড়ানো আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, পকেট থেকে তৃষার লেখা চিঠি ও আঙটিটা বের করে ধরিয়ে দিল প্রফেসরের হাতে। তিনি ওগুলো খুঁটিয়ে দেখছেন, ও বলল, 'আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম, প্রফেসর।' এরপর কি করতে হবে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল।

চিঠি ও আঙটি স্লিপিং গাউনের পকেটে ফেলে প্রফেসর চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। একটা ব্যাগ নিতে পারব তো, মিস্টার রানা?'

'ছোট একটা।'

'কয়েকটা ব্যক্তিগত জিনিস আর কিছু কাগজ-পত্র।'

পাঁচ মিনিট পর প্রফেসরকে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এলো রানা। একটা গাড়ির শব্দ পেল ও। এদিকেই আসছে। স্যাঁৎ করে গাঢ় ছায়ায় ঢুকে পড়ল রানা, চাঁদের আলোয় একা দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রফেসর চৌধুরী।

গাড়িটা গার্ডদের। তারা টহল দিতে বেরিয়েছে। ড্রাইভার প্রফেসরের পাশে জীপ থামাল। 'আজ রাতেও খেত দেখতে বেরিয়েছেন, স্যার?' একজন গার্ড জিজ্ঞেস করল। 'আপনি ঘুমান কখন?'

'আগে বলো তোমরা কখন ঘুমাও?' সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রফেসর চৌধুরী। 'যখনই কোন কাজে বাইরে বেরোই, দেখি টহল দিচ্ছ তোমরা।'

গার্ডরা হেসে ফেলল। একজন বলল, 'এটাই তো আমাদের চাকরি, সার। পাহারা দেয়া।'

'আর আমার দায়িত্ব দু'তিন ঘণ্টা পর পর দেখা ধানগাছগুলো রঙ পাল্টাচ্ছে কিনা।'

গার্ডদের একজন সবিনয়ে বলল, 'আপনি কত বড় বিজ্ঞানী, আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে...'

জীপ ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আবার রওনা হয়ে ধানখেতে নিরাপদেই পৌঁছাল ওরা। প্রফেসর চৌধুরীকে পাশের সিটে বসিয়ে কপ্টারের এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। খক-খক করল এঞ্জিন, স্টার্ট নিল না, আবার একবার খক-খক করে যান্ত্রিক ও কর্কশ যে হাসিটা হাসল তা আর থামল না।

পাইলটের সিট থেকে রানা দেখতে পেল পাকা রাস্তার ওপর জীপটা দাঁড়াল। সন্দেহ নেই কপ্টার এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে গার্ডরা। জীপ ইউ টার্ন নিচ্ছে। তারপর রাস্তা ছেড়ে খেতের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল সেটাকে।

হঠাৎ জীপের মাথায় বসানো সার্চলাইটটা জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। কপ্টার আর তার আরোহীদের স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে গার্ডরা। তাদের চোখের সামনে লাফ দিয়ে, ঝাঁকি খেতে খেতে, শূন্যে উঠছে যান্ত্রিক ফড়িং।

'জীপে রেডিও আছে কিনা জানেন?' প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে,' চিৎকার করে জানালেন ফারুক চৌধুরী। তাঁর চিৎকার ও এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রাইফেলের শব্দ।

ওদের মাথার সামান্য ওপরে উইন্ডস্ক্রীনের কিছু একটা ভেঙে গেল। কাঁটাতারের বেড়া ধরে খানিক পর পর বসানো টাওয়ারের মাথায় এক এক করে জ্বলে উঠছে সার্চলাইটগুলো।

'সিটের হাতল ধরে শক্ত হয়ে থাকুন,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল রানা। আকাশ জুড়ে ছুটোছুটি করছে সার্চলাইটের আলো। মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে রয়েছে কপ্টার, বেড়ার মাথা প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে যাবে আলোর চঞ্চল টানেলগুলোর ফাঁক গলে। নিচে, আরও নিচে!–চিন্তা করছে রানা–ওরা আমাদের আকাশে খুঁজছে।

কপ্টার আরও নামল, মাটি থেকে এখন মাত্র দশ ফুট ওপরে। রাতের নিস্তব্ধতা অকস্মাৎ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল মেশিন গান গর্জে ওঠায়। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটছে, তবে ওগুলোর নিচে রয়েছে কপ্টার। কাঁটাতারের বেড়ার সামনে চলে এলো। সংঘর্ষ ঘটতে বাধ্য। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কপ্টার নিয়ে খানিকটা ওপরে উঠল রানা। বেড়ার হাতখানেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা।

সার্চলাইটের আলো দ্রুত পিছিয়ে পড়ল। অন্ধকার আকাশে

নিঃসঙ্গ কপ্টার এখন প্রায় কোন শব্দই করছে না। এটাই এর ক্রটি বা গুণ, যাই বলা হোক। স্টার্ট নেয়ার পর তিন মিনিট ভয়ানক শব্দ করবে, তারপর একদম বোবা।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফেসর চৌধুরী বললেন, 'সারাটা জীবন ল্যাবে কাটিয়ে দিয়ে এখন দেখছি অনেক মজার জিনিসই মিস করেছি।'

হাসল রানা। প্রবল উত্তেজনায় ভালমানুষ প্রফেসর নিজের মেয়ের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। এখনও জানতে চাননি কোথায় আছে সে।

সারাং জাইদের তাঁবু চেনা গেল সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয়। সর্দার মুরাদ খাজাই কিছু বাড়িয়ে বলেননি, এরই মধ্যে তাঁবু গোটানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে তারা, মালপত্র বেশির ভাগই তোলা হয়ে গেছে উটের পিঠে।

বারো

রানা যেন দুর্গম পাহাড় আর মরুভূমি পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢোকেনি, অসমসাহসী প্রায়-জংলী লোকেদের দলে ভিড়ে গিয়ে গিরিসংকট পেরোয়নি, আফগানিস্তানে এসে মৃদুভাষী মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্রফেসর ফারুক চৌধুরীকে তুলে দেয়নি চার্টার করা প্লেনে। রানা যেন এখনও আঁকাবাঁকা ফ্রেঞ্চ রোডে লুসিন্ডা লাজুলির সঙ্গে গাড়ি নিয়ে রেস খেলছে। কিন্তু না, লাজুলি মারা গেছে। প্যারিস কলামিস্টদের অন্য এক গো-গো গার্ল খুঁজে

নিতে হবে। তবে অন্য রকম নয়, রানার দরকার ঠিক আরেকটা লাজুলি।

কিন্তু হায়, রানার দুর্ভাগ্য, আরেকটা লাজুলি ঈশ্বর তৈরি করেননি।

বোর্দেয়াক্স ও বায়োনি-র মাঝখানের রাস্তাটা দু'সারি গাছের ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল ঠিক যেন একটা চওড়া সরলরেখা। জাগুয়ারটাকে খেপা জন্তুর মতই ছোটাচ্ছে রানা। খুব কি তাড়া আছে ওর? তা একটু আছে বৈকি। সোহেল ওকে জানিয়েছে, বে অভ বিস্কে-র দিকে বিদ্যুৎচমক, বজ্রপাত, ঝড় আর বৃষ্টি নিয়ে প্রবল বেগে ছুটে আসছে খারাপ একটা আবহাওয়া। তার ধারণা, এই দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে তৃষাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে ওয়াসিম মালিক, সম্ভবত সাগর পথেই।

দেশ থেকে আসা আরও একটা ভাল খবর রানাকে দিয়েছে সোহেল। প্রফেসর ফারুক চৌধুরী রাহাত খানকে বলেছেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে পেরে মহাখুশি তিনি। বাংলাদেশ সরকার তৃষাকে তাঁর সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ন, তবে সরকারের দেয়া আশ্বাসে বিশ্বাস রাখতেও রাজি হয়েছেন। আবার এ-ও বলেছেন, 'ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়ে আমার কাজ যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, সবার চেয়ে সেটা আমি বেশি বুঝি।' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গবেষণার কাজ শুরু করতে চান বলে জানিয়েছেন। তবে বিসিআই প্রধানের ব্যক্তিগত ধারণা হলো, মেয়েকে না পাওয়া পর্যন্ত প্রফেসর শুধু মানসিকভাবে কাতর থাকবেন না, গবেষণার কাজেও তিনি পিছিয়ে পড়বেন। কারণ বাবার সেক্রেটারি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছিল তৃষা। তার অভাব অন্য কাউকে দিয়ে সহজে পূরণ হবার নয়।

পাশের সিটে বসা রফিক হাতঘড়ি দেখল। 'মাঝরাতের আগেই ওখানে আমরা পৌঁছে যাব, মাসুদ ভাই। ঝড়টা সময়ের আগে না পৌঁছালেই হয় এখন।'

‘আমি আবহাওয়া দফতরের সঙ্গে কথা বলেছি,’ বলল রানা। ‘ওরা বলছে, সকালের আগে জোরালো কিছু ঘটবে না।’

ওয়াসিম মালিককে শাস্তি দেয়ার কাজে সঙ্গে কাউকে রাখতে না হলেই খুশি হত রানা, কিন্তু ওর যেরকম প্ল্যান তাতে অন্তত আরও একজন লোক দরকার।

‘এরিয়াল ফটোগ্রাফে যা দেখলাম, ভিলা সান সাউসিকে ক্লান্ত কূটনীতিকদের বিশ্রাম নেয়ার জায়গার চেয়ে দুর্গম একটা দুর্গ বলেই মনে হলো। মাসুদ ভাই, আমরা সাগর দিয়ে যাচ্ছি না কেন? অনেক কাছাকাছি পৌঁছে ভেতরটা দেখার সুযোগ পেতাম।’

‘সেক্ষেত্রে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হত। পাহাড়ের কার্নিসে গার্ড আর কুকুর আছে, উঁকি দিয়ে ভিলাটা দেখার সুযোগও পেতে না,’ বলল রানা। ‘তাছাড়া, ফটো বিশ্লেষকরা বলছে, লনের উঁচু আকৃতিটা আসলে একটা পানির রিজারভয়ের। কিন্তু আমার ধারণা, ওটা একটা মেশিন গান। আর কোন প্রশ্ন, রফিক?’ রানা হাসছে।

রফিকও হাসল। ‘আছে, মাসুদ ভাই, আরেকটা প্রশ্ন আছে। এই স্যাটেলাইট ফটোগুলো কোত্থেকে পেলাম আমরা? যখন প্রয়োজন হয় তখনই চলে আসে—কারা দেয়?’

‘আমেরিকা, রাশিয়া আর চীন থেকে আসে, রফিক,’ বলল রানা ‘যখন যেখান থেকে আনতে পারে বিসিআই। তবে তারমানে এই নয় যে সবসময় চেয়ে আনা হয়। আমাদের পেশায় চুরিকেও এসপিওনাজ বলে, জানোই তো।’

এরপর অনেকক্ষণ আর কথা হলো না। তারপর একসময় ছোট্ট রিসর্ট টাউন বিয়ারিজ-এ পৌঁছে গেল রানার স্পোর্টস কার। নিস্তব্ধ শহর। প্রায় ফাঁকা রাস্তা। মরশুম নয়, তাই ট্যুরিস্টরা আসেনি। উপকূলের ধারে ধারে বেশিরভাগ ভিলাই খালি পাওয়া যাবে। টার্গেট আর ওর ওয়ালথারের মাঝখানে নিরীহ লোকজনের ভিড় দেখতে চায় না রানা। ভেতরে তৃষা না থাকলে হাই এক্সপ্লোসিভ দিয়ে আইএসআই-এর সেফ হাউসটা উড়িয়ে

দিত ও।

শহরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই রানা লক্ষ করল, বাতাসের তীব্রতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, সেই সঙ্গে পানি ভরা মেঘও সবেগে ছুটে আসছে বে অভ বিস্কের দিকে। অনেক নিচে ঢেউগুলো লম্বা, সাদা রেখার মত দেখাচ্ছে। এক সময় বাঁক নিয়ে প্রধান সড়ক থেকে বেরিয়ে এলো জাগুয়ার, ফিরে যাচ্ছে ওরা–তবে শহরে নয়, পাহাড়গুলোর দিকে।

শহরটা রানা আগে দেখেনি, তবে এরিয়াল ম্যাপে চোখ বুলিয়ে মনের পর্দায় গেঁথে নিয়েছে প্রতিটি খুঁটিনাটি। পাহাড়ী পথের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে রাস্তা থেকে সরে গাড়ি থামাল ও।

সড়কপথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ওরা। পথের মাত্র অর্ধেকটা পেরুলেও, ছোট একটা পাহাড়ের সমতল চূড়ায় গজিয়ে ওঠা পাইনবনের ভেতর থেমেছে ওরা। কয়েকশো ফুট নিচে শুধু শহর নয়, সাগরও দেখতে পাচ্ছে। ওদের বাঁ দিকে একটা লাইটহাউস, ভূমি ও সাগরের দিকে আলো ফেলে সংকেত দিচ্ছে একজোড়া সার্চলাইট।

'পঞ্চাশ গজ ভেতর দিকে পাওয়া যাবে ফায়ার-ওয়াচ টাওয়ারটা। চলো জিনিস-পত্র নিয়ে ওটায় উঠি।'

জিনিস-পত্র মানে ইনফ্রারেড ইকুইপমেন্ট। টাওয়ারের খাড়া ধাপ বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলো ওরা। ইকুইপমেন্টগুলো বসানো হলো। আইপীস-এ চোখ রেখে আইএসআই ভিলার ওপর দৃষ্টি বুলাল রানা। 'যা ভেবেছি,' বলল ও। 'ওটা একটা মেশিন গানই। গোটা চত্বরটা কাভার দিচ্ছে। গেটে গার্ডের ব্যবস্থা করার পর ওটাই হবে আমাদের এক নম্বর সমস্যা।' অন্ধকারে খানিক পরপর দু'একটা করে কথা বলে গেল রানা, রফিককে ওর অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে একটা ধারণা দিচ্ছে।

'মাসুদ ভাই,' এক সময় বলল রফিক, 'গার্ড বলা হলেও, ওরা কিন্তু পাকিস্তান রেগুলার আর্মির সদস্য।'

অন্ধকারে হাসল রানা। 'কেন, তোমার মনে নেই, এই পাকিস্তান আর্মিকেই আমরা একবার পরাজিত করেছি? তবে, সত্যি ওরা খুব কড়া পাহারা দিচ্ছে। পাঁচিলগুলোও দেখো না, যেন চীনের প্রাচীর।'

বৃষ্টির অল্পকিছু বড় ফোঁটা পড়ল। চোখ নামিয়ে আলোড়িত সাগরের দিকে তাকাল রানা।

'ওরা যদি তৃষাকে বোটে তুলে সরাবার কথা ভেবে থাকে, সকালের দিকে কোনমতেই পারবে না। আর যদি সী-প্লেন ব্যবহার করার প্ল্যান থাকে, সেটাও বাতিল করতে হবে।' অন্ধকারে ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। 'আজ রাতে তৃষাকে নিয়ে প্যারিসে আমরা ফুচকা আর চটপটি খাব সিলেটের সলিমুদ্দি মিয়ার দোকানে বসে।'

এরপর আর কোন কথা হলো না।

ঝমাঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে আরও যে-সব ইকুইপমেন্ট রয়েছে সেগুলো তারপুলিন দিয়ে ঢাকা হলো। কাঠের তৈরি টাওয়ারের নিচে নেমে এসে প্ল্যাটফর্মের তলায় দাঁড়িয়ে না ভেজার চেষ্টা চলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল–না থামে বৃষ্টি, না হয় সকাল।

রানার মৌন ভাব লক্ষ করে চুপ করে আছে রফিকও। পুরানো দৃশ্যগুলো বারবার ফিরে আসছে রানার মনে ও মাথায়। ঠিক যেন বন্য ও চঞ্চল একটা হরিণ ছিল, যার রূপ-যৌবন দেখলে পরমায়ু পেতে ইচ্ছে করে, একা বাস করত একটা হাউসবোটে; বুড়ো এক কুঁড়ের বাদশা ছিল তার ভক্ত বা বন্ধু। আসন্ন অ্যাকশনটা শুরু হতে যাচ্ছে, সেজন্যে রানা সন্তুষ্ট। দুই পক্ষের শক্তি সমান নয়, এই বাস্তবতা ওকে বিচলিত করছে না। অ্যাকশনের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনতে পারবে বলে বিশ্বাস করে ও। হামলার জন্যে আইএসআই তৈরি নয়, কাজেই বিস্ময়ের ধাক্কাটা রানার খুব কাজে লাগবে।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে সশস্ত্র একদল সৈন্য যা করতে পারবে না, বুদ্ধিমান ও সাহসী হলে এক বা দু'জন এসপিওনাজ এজেন্ট খুব সহজেই তা করে দেখাতে পারে।

অনেকক্ষণ পর রানাই প্রথম কথা বলল, 'আলো ফুটতে আর আধ ঘণ্টা বাকি। চলো, রফিক, শুরু করা যাক।'

ঝম-ঝম হিম ঠাণ্ডা বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে এলো ওরা। রফিক গেল মর্টারের দিকে। কাঠের ধাপ বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে অস্ত্রপাতির ওপর থেকে তারপুলিন সরাল রানা। দু'এক পশলা গুলি করে গানগুলো টেস্ট করে নিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

একটু পরপরই চমকানো বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে আকাশ, প্রতিবার দু'এক মুহূর্ত পর পাহাড়ে পাহাড়ে বজ্রপাত ঘটছে। আপনমনে হাসছে রানা। ভাগ্য কখন কিভাবে সহায়তা করে! আইএসআই ভিলায় ও যদি এখন একটা অ্যাটম বোমাও ফেলে, বিয়ারিজ-এর বাসিন্দারা আওয়াজটাকে বজ্রবৃষ্টির অংশ বলেই মনে করবে।

টাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে রানাকে আকাশ দেখাচ্ছে রফিক। তার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা, চিৎকার করে বলল, 'গার্ডহাউস থেকে গার্ড বেরুলে আমি রাইফেল দিয়ে তাকে ফেলে দেব, কারণ তা না হলে আমরা ভেতরে ঢোকার সময় পিছন থেকে হামলা করবে। আমি হয়তো তোমাকে রেঞ্জ জানাবার সময় পাব না, তবে আমার কাছ থেকে সিগন্যাল না পাওয়া পর্যন্ত ওদিকে তুমি একের পর এক শেল ফেলবে।'

উত্তরে কিছু একটা বলল রফিক, কিন্তু তার চিৎকার বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল। এই প্রবল বাতাস আইএসআই-এর পক্ষে যাবে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব করে তুলবে।

উপকূল ববাবর বিদ্যুতের চোখ ধাঁধানো নাচ চলছেই। ভারী মেঘের আড়াল থাকায় ভোর হতে সময় লাগছে বেশি। তারপরও

রানার মনে হলো, পিরেনীস-এর এবড়োখেবড়ো রিজ অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছে ও। সময় ঘনিয়ে আসছে।

ধুৎ, ভাবল রানা, এই আলোতেও শুরু করা যায়। নিচে তাকিয়ে ছায়ামূর্তির উদ্দেশে নির্দেশ দিল ও। দেখল প্রথম শেলটা পাইপে ভরছে রফিক। এবার শুরু হবে খেলা।

চোখ তুলে ভিলার মেশিন গান এমপ্লেইসমেন্টের দিকে তাকাল। শেলটা বিস্ফোরিত হলো দশ গজ বাঁ দিকে। হাত নেড়ে রফিককে রেঞ্জ বদল করার সংকেত দিল ও। দ্বিতীয় রাউন্ডটা পাঁচ গজ ডান দিকে। এই আওয়াজটার পরপরই কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল। রানাকে অবাক করে দিয়ে গান এমপ্লেইসমেন্ট থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলে এক লোক, বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। রফিকের পরবর্তী মর্টার শেল উড়িয়ে দিল তাকে। এরপরই গেট হাউস থেকে খুদে খেলনা সৈনিকের মত বেরিয়ে এলো একজন গার্ড। রানার হাতে গর্জে ওঠা রাইফেল তাকে ফেলে দিল।

কুকুর নিয়ে একদল লোক লন হয়ে গান এমপ্লেইসমেন্টের দিকে ছুটে আসছে। পাকিস্তানী মেশিন গান ইতিমধ্যে টার্গেটের খোঁজে চরকির মত ঘুরতে শুরু করেছে। রফিকের মর্টার শেল ক্রমশ ওটার আরও কাছে পৌঁছাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে লক্ষ্যভেদে সফল হবে সে।

গার্ডরা লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে ঘুরে দৌড় দিল আবার ভিলার দিকে। মেশিন গানটার আয়ু যে প্রায় শেষ, এটা তারা বুঝে নিয়েছে। দলটাকে টার্গেট করে গুলি চালাল রানা, কয়েকজনকে পড়তেও দেখল।

চোখের কোণে ধরা পড়ল সাদা পা'জামা আর হাতকাটা গেঞ্জি পরা পরিচিত একটা আকৃতি ভিলার ভেতর দিকের পাকা চত্বরে ছিটকে বেরিয়ে এলো, ভারী ও ভরাট গলা থেকে কর্কশ নির্দেশ বেরুচ্ছে। ঝট্ করে তার দিকে রাইফেল ঘোরাল রানা। কিন্তু তার

নাম ওয়াসিম মালিক; ভাগ্য, বুদ্ধি ও ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সহায়তা না পেলে কি এত উঁচুতে উঠতে পারত? তাকে যে টার্গেট করা হয়েছে, কিভাবে যেন বুঝতে পেরে ডাইভ দিল, শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পাঁচিলের আড়ালে। রাইফেলের বুলেটটাকে ব্যর্থ হতে দেখল রানা, একটা পিলারের ছাল তুলল শুধু।

লনে ছড়িয়ে পড়া গার্ডগুলোর দিকে মনোযোগ দিল রানা। এই সময় রফিকের মর্টার প্রত্যাশা পূরণ করে সরাসরি আঘাত করল হেভি মেশিন গানে, বলা যায় ভেঙে চুরমারই করে দিল। এটা ভেতরে ঢোকার সংকেতও বটে। রাইফেল হাতে সিঁড়ির দিকে ছুটল রানা, জাগুয়ারে পৌঁছাল রফিকের সঙ্গেই।

আঁকাবাঁকা পিচ্ছিল পথে আবার ছুটল ওদের গাড়ি, ভোরের বাতাস কানে গজরাচ্ছে। পেটমোটা মেঘগুলো থেকে বিদ্যুতের বাণ ছোঁড়াছুঁড়ি আগের মতই চলছে।

'মাসুদ ভাই,' রানার কানে গলা ফাটাচ্ছে রফিক, 'আপনি কাভারিং ফায়ার দিন, কারণ আপনার হাত আমার চেয়ে ভাল। আমিই প্রথমে ভেতরে ঢুকি।'

মাথা নেড়ে গাড়ি থামাল রানা, কাল রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখান থেকেই দ্বিতীয় পর্বের হামলাটা শুরু করবে।

রফিক ওর একটা হাত চেপে ধরল। 'ভাববেন না একবার ব্যর্থ হয়ে আপনার কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি। মনে আছে, লেবাননে আমাকে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিলেন? ওখানেই আমি ঘরে ঘরে ঢুকে, অল্প একটু জায়গার ভেতর যুদ্ধ করার ট্রেনিং পেয়েছি। এটা একটা আর্ট, মাসুদ ভাই। আমার জন্যে শুধু আর্ট নয়, নেশাও। তাছাড়া, এই কাজে আপনার চেয়ে আমি ভাল।'

রানাকে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে হলো। রফিকের কথায় যুক্তি আছে। ব্যাক সিট থেকে একটা সাবমেশিন গান তুলে নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'সাবধান, ভাই; ট্রেনিংটা যেন অপচয় না

হয়। তবে আননেসেসারি কোন ঝুঁকি নিতে যেয়ো না।'

রফিক আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় হাসছে। মুখে যাই বলুক, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার তাগিদটা প্রবল ভাবেই অনুভব করছে সে। রাস্তার পাশের পাঁচিল টপকাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার, 'সলিমুদ্দিনের দোকানে দেখা হবে, মাসুদ ভাই!'

পাঁচিলের ওপারে ছোট বড় পাথরের ফাঁকে ঘাস জন্মেছে, সেই ঘাস আর পাথরের আড়াল নিয়ে ছুটছে রফিক। একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকল রানা প্রথম গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায়। গান ফ্ল্যাশ ঝলসে ওঠা মাত্র অস্বাভাবিক রিফ্লেক্স অ্যাকশনের কারণে রানার হাতেও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলটা। আরও কয়েকটা অস্ত্র গজে উঠল। প্রায় কোন সময় না দিয়েই প্রতিটি গুলির জবাব দিল রানার রাইফেল, তারই ফাঁকে সিলেক্টর বদলে ভিলার কয়েকটা জানালার ভেতরও গুলি করল। বিরতি ও নিস্তব্ধতার সময় সাবধানে এগোল ও, পাঁচিল টপকে নিজেও ঢুকে পড়ল ভিলার ভেতর। এরইমধ্যে অন্তত দুটো জানালা নিরব হয়ে গেছে।

পাথর ও ঘাসের ভেতর থেকে রফিককে দেখতে পেল রানা, দু'জনের মাঝখানে বৃষ্টির ঝালর থাকায় অস্পষ্ট; একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে শেষ অল্প একটু দূরত্ব পেরুবার জন্যে তীরবেগে ছুটছে সরাসরি দরজা লক্ষ্য করে, একই সঙ্গে দাঁত দিয়ে পিন খুলে গ্রেনেডও ছুঁড়ছে। তবে না। গ্রেনেডগুলোকে দরজার ভেতর ঢুকে বিস্ফোরিত হতে দেখল রানা। রফিকের হাতে সাবমেশিন গান থেকেও ব্রাশ ফায়ার হচ্ছে। কিন্তু না। রফিক নিজে দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল না। কোত্থেকে বুলেটটা এলো বলা মুশকিল, যেন অদৃশ্য একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেল রফিক, তারপর ঢলে পড়ল।

রানার কাছে গ্রেনেড আছে, দরকার সাবমেশিন গানটা। ভিলার ভেতর ঢুকতেই হবে ওকে। বৃষ্টির পানি স্রোতের মত

বইছে, প্রায় সাঁতার কেটে এগোতে হচ্ছে রানাকে। দুটো জানালা থেকে গুলি হলো। মাথার ও নিতম্বের পাশের দুটো বোল্ডারের টুকরো ভেঙে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। জানালা দুটোর ভেতর দু'তিনটে করে গুলি করল রানা। রফিকের লাশের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় আবার ফায়ার শুরু করল ওরা। সাবমেশিন গানটা টেনে নিয়ে ক্রল করে দরজার দিকে এগোচ্ছে ও। কোথাও না থেমে একটা নাপাম বোমা ছুঁড়ল দরজার ভেতর, ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল দরজার পাশের দেয়ালে। ওর কাছে আরও দু'একটা নাপাম বোমা আছে, প্রথমটা নিচতলার হলরুমের ভেতর বিস্ফোরিত হতে আরও একটা ছুঁড়ল দোতলার একটা জানালার ভেতর।

দরজার ভেতর ডাইভ দেয়ার সময় হলরুমে শুধু আগুন দেখতে পেল রানা, সেই আগুনের ভেতর দু'একজন গার্ড ছুটোছুটি করছে। ওর হাতের সাবমেশিন গান থেকে কয়েক পশলা গুলি বেরুল। যেদিকটায় আগুন সেদিকে ছুটল রানা, সামনে এই প্রথম একটা দরজা পড়ল, ভেতর থেকে বন্ধ। যেভাবেই হোক ওর ধারণা হলো, ঘরটার ভেতর রাইফেল নিয়ে দু'জন লোক আছে।

কাঁধের ধাক্কায় দরজা ভাঙো। তারপর একটা গ্রেনেড ছোঁড়ো। সরে এসে আড়াল নাও। বুম! গ্রেনেড ফাটল। শালারা ধাক্কাটা সামলে নেয়ার আগেই এক ছুটে ভেতরে ঢোকো, ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে। কামরার চারদিকে স্প্রে করো। রানার হাতে মেশিন গান লাফাচ্ছে, খালি কার্তুজগুলো ড্রপ খাচ্ছে মেঝেতে।

এবার জলদি, রানা! এখান থেকে কেটে পড়ো। তবে একটা চোখ রাখো পিছনে, কেউ হয়তো এখনও নিঃশ্বাস ফেলছে, হাত বাড়াচ্ছে পড়ে থাকা রাইফেলের দিকে। এবার পাশের কামরা। তুমি নও, প্রথমে গ্রেনেড। আরও দ্রুত পিছিয়ে আসা দরকার ছিল, মুখটা তো একটুর জন্যে পুড়ল না।

আরেক কামরায় ঢোকো, গ্রেনেডের পিছু নিয়ে। এভাবে

একের পর এক। ক'টা হলো? সাতটা? তাহলে করিডরে বেরোও। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠো।

ক'জন মরল গোণার দরকার নেই, রানা। ধরো একজনও মরেনি। কারণ যারা মারা গেছে তারা নর্দমার কীট। কীট মরলে কেউ হিসেব রাখে? কিংবা ধরো বিশজন মারা গেছে, এবং এই বিশজন তাদের জীবদ্দশায় অন্তত দুশো নিরীহ ভালমানুষকে খুন করেছে, বেঁচে থাকলে আরও করত। এ হলো দেখার রকমফের, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। কেউ হয়তো বলবে, তুমি মানবজাতির উপকার করে পুণ্য অর্জন করেছ।

গুলি করতে করতে ধাপ বেয়ে দোতলায় উঠে এলো রানা। নিচে যা করেছে, এখানেও তাই শুরু করল। গ্রেনেডের পিছু নিয়ে প্রতিটি কামরায় ঢুকছে। ঢোকার সময় ব্রাশ ফায়ার করে ফেলে দিচ্ছে লোকজনকে, যদি কেউ তখনও জীবিত থাকে। তারপর রানার বোধোদয় হলো। কাকে গুলি করছে সে? গোটা বাড়িতে কেউ বেঁচে আছে কি? সে ছাড়া?

ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে এখনও। রোলেক্স দেখে সময়ের একটা হিসাব পাওয়া গেল। পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢোকার পর মাত্র বিশ মিনিট পার হয়েছে।

আইএসআই এজেন্ট একজনও বেঁচে নেই, কিন্তু রানা যাদেরকে গুলি করেছে তাদের মধ্যে ওয়াসিম মালিক ছিল না। ছিল না তৃষা চৌধুরীও। তারমানে কি তৃষাকে নিয়ে পালিয়েছে মালিক?

রানার ঠোঁট বেঁকে গেল। ক্ষীণ এই হাসিটুকু যে-কেউ দেখলে শিউরে উঠবে। হৃদয়হীন পাষাণ কিংবা কোন পাষণ্ড বা পিশাচও বোধহয় এই অতি সামান্য হাসিতে এত বেশি নিষ্ঠুরতা ফোটাতে পারবে না। আবার, যত নিষ্ঠুরতাই থাকুক, তার সঙ্গে বিদ্রূপের যে সংমিশ্রণ ঘটেছে, তারও বুঝি কোন তুলনা চলে না। 'পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়!' বিড়বিড় করল ও, এগিয়ে এসে প্লেট গ্লাস

লাগানো কিচেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। যা ভেবেছে! এক মাস্তুলওয়ালা একটা বোট, ডক ছেড়ে রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সন্দেহ নেই ওয়াসিম মালিকের বোট ওটা। পালাচ্ছে সে। বোটে তৃষাও না থেকে পারে না। কিচেনের দরজা বিস্ফোরিত হলো। বেরিয়ে এসে সৈকতের দিকে ছুটছে রানা।

মালিককে দেখতে পেল ও, দু'জন ক্রুর সাহায্যে পালটা তোলার চেষ্টা করছে। খালি মেশিন গানটা বয়ে বেড়াবার কোন মানে হয় না, ফেলে দিয়েছে রানা।

বাতাস এখনও তীব্র। পালটার পত-পত আওয়াজ পরিষ্কার ভেসে আসছে কানে। বোটের পিছনে পানিতে ফেনা তৈরি করছে মোটর। মালিকের উচিত ছিল পাল না তুলে বোটটাকে আগে স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নেয়া, যেহেতু বাতাস ডকের দিকেই বইছে। তা না করায় এখন তাকে বোট ছাড়তে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

ডকের এদিকের প্রান্তে, একটা ইউটিলিটি শেড-এর আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে বোটটাকে দেখছে রানা। বোট আর ওর মাঝখানে ফাঁকা ডক একশো ফুট হবে। পার হতে দেখলে কুকুরের মত গুলি করে মারবে ওকে।

একটু চিন্তা করতেই কি দরকার বুঝতে পারল রানা। শেডের পচা কাঠের দরজা থেকে মরচে ধরা প্যাড লকটা খুলতে কাজে লাগল ছুরিটা। ভেতরে ঢুকে দেখে ওর যা প্রয়োজন সবই আছে। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টগুলো বাছাই করতে একমিনিটও লাগল না। এরপর বিবস্ত্র হলো।

বাইরে বেরুতে ওর শরীরে এক হাজার পিঁপড়ের কামড় বসাল বৃষ্টির ফোঁটা। রানার চোখের সামনে দুনিয়ার কোন রঙ নেই, সবই ধূসর ও আবছা। ক্ষুব্ধ, প্রতিবাদমুখর সাগরে ডাইভ দিয়ে সাদা ফেনার ভেতরে হারিয়ে গেল ও।

তেরো

খেপা সাগর রানাকে নিয়ে নিষ্ঠুর এক খেলায় মেতে উঠতে চাইল। বুদ্ধি করে লড়তে না চেয়ে, 'যেমনি খেলাও তেমনি খেলি' এরকম একটা ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণ করল রানা, স্রোতের বিপরীতে গেলই না। একটু পরই দেখতে পেল বোটের মুখ সঠিক দিকে ঘুরিয়ে নিতে পেরেছে মালিক আর তার ক্রুরা, তবে পাল না খুলে কাজটা সারতে পারেনি। এখন তারা রওনা হতে যাচ্ছে, তবে ডক এরিয়া ছাড়িয়ে আসার পর পালটা আবার তুলতে হবে। সঙ্গে রশি ছাড়াও অন্যান্য জিনিস রয়েছে, তার ওপর অশান্ত সাগর, সাঁতার কাটতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে রানার।

শুধু ডুবে মরার নয়, গুলি খেয়ে মরার ঝুঁকিও নিতে হলো। বিশাল মেইনসেইল ওকে আড়াল করে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু এখন যদি কেউ বোটের সামনে চলে আসে ওকে দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। আর এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেখামাত্র গুলি করা হবে।

রেইলটা নাগালের মধ্যে চলে আসছে। চলেও এলো। কিন্তু বোট এই সময় দুই ঢেউ-এর মাঝখানে ডাইভ দেয়ায়, দৃশ্যটা কেউ দেখলে ভাবত বারবার তুলে পানিতে আছাড় মারা হচ্ছে রানাকে। ওই রকম একটা আছাড়ের বদৌলতেই রেইলিং টপকে ডেকের ওপর পড়ল, মুখ থেকে হড়হড় করে পানি বেরুচ্ছে। বোট কাত হচ্ছে ঘন ঘন, রেইলিং ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে

সিধে হচ্ছে ও। এই সময় একজন ডেকহ্যান্ডকে দেখতে পেল। তেকোনা পালটা খুলতে আসছে। হঠাৎ সামনে নগ্ন একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কে না চমকাবে। ককপিটের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে কি যেন বলল সে। কিন্তু ককপিট আর তার মাঝখানে পালটা রয়েছে, ফলে ওদিকের লোকজন তাকে দেখতে পাচ্ছে না। আর কথাগুলো বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল উল্টোদিকে। ব্যাক পকেট থেকে একটা প্লায়ার্স বের করে মারমুখো ভঙ্গি নিল সে, রানার দিকে এগিয়ে আসছে।

প্লায়ার্স রানার মাথা লক্ষ্য করে চালাল। একপাশে সরে এসে লোকটার কব্জি ধরল রানা, অপর হাত দিয়ে ঘুসি মারল পেটে। লোকটা কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, প্লায়ার্স ধরা হাতটা তার মাথায় নামিয়ে আনল। নিজের হাতে, নিজেরই প্লায়ার্সের আঘাতে যে খুলিটা ফাটাল সে, সেটাও তার। লোকটাকে ডেকে পড়তে দিল না রানা, দু'হাত ধরে ঠেলে দিল রেইলিঙের ওপর। একটা ডিগবাজি খেয়ে আলোড়িত সাগরে পড়ে হারিয়ে গেল সে।

মাস্তুল আর পালের ফাঁক দিয়ে ওয়াসিম মালিককে হুইলে দেখতে পাচ্ছে রানা। তার কাছে নিশ্চয়ই অস্ত্র আছে, কাজেই সামনে দিয়ে যেতে চাইলে ধরা পড়ে যাবে ও। মাথায় একটা প্ল্যান তৈরি হলো। প্ল্যানটাকে সফল করতে হলে অটল সাহস আর ক্ষিপ্রতা দরকার হবে। অন্য কোন বিকল্পও নেই। প্ল্যানটা কাজ না করলে আইএসআই-এর হাতে দ্বিতীয়বারের মত বন্দী হতে হবে ওকে।

পিচ্ছিল ডেক ধরে সাবধানে হাঁটছে রানা। রেইলের কাছে এসে জিব শীটটা চিরে দিল। তেকোনা পাল ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেল, বাতাসের ঝাপটায় গুলির মত আওয়াজ করছে। রানা সন্তুষ্ট, হেঁটে মাস্তুলের কাছে এসে অপেক্ষায় থাকল।

যতটা কঠিন হবে বলে ভেবেছিল তারচেয়ে একশো গুণ সহজ লাগল কাজটা। আরও এক পাকিস্তানী ডেকহ্যান্ড ডেক ধরে

টলতে টলতে ছুটে এলো, জিব শীট বরবাদ করায় অদৃশ্য সঙ্গীকে গাল দিচ্ছে। রানা আন্দাজ করতে পারছে, জিববিহীন বোটটাকে কোর্সে ধরে রাখতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে মালিককে।

দ্বিতীয় ডেকহ্যান্ড মাস্তুলকে পাশ কাটাচ্ছে। হিংস্র চিতার মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। এক হাতে ধরল শার্টের কলার, আরেক হাতে নিতম্বের ওপর বেল্ট, তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল রেইলিঙের দিকে। রেইলিং টপকে সে-ও খেপা সাগরে হারিয়ে গেল।

মালিক তার লোককে সাগরে পড়তে দেখল কি দেখল না তাতে রানার কিছুই আসে যায় না। মালিক নিজেই এবার বিস্ময়ের শিকার হতে যাচ্ছে।

মাস্তুলটাকে এক হাতে শক্ত করে ধরল রানা, কারণ বোটটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা খাবে। ক্ষীণ অথচ নির্দয় সেই হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে আবার ফুটল। ছুরির ডগাটা বড় পালের মাঝখানে ঢোকাল, বাতাসের তীব্র চাপ যেখানটায় সবচেয়ে বেশি, তারপর লম্বা টান দিয়ে চিরে ফেলল কাপড়টা। ফলাফলটা দেখার মতই হলো। বাকিটুকু সারল বাতাস। প্রকাণ্ড মেইনসেইল ওক গাছে বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে ছিঁড়ে গেল, চোখের পলকে সহস্র টুকরো হয়ে উড়ে গেল ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে। তবে এত সব দেখার সময় পায়নি রানা। অল্প দু'চার সেকেন্ড মাত্র পেয়েছে, তাতেই দূরত্বটুকু লাফ দিয়ে পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ককপিটে—চুল বাতাসে উড়ছে, হাতে বাগিয়ে ধরা ছুরি।

এক পলকের জন্যে ওয়াসিম মালিকের চোখে ভয় ফুটল। পরমুহূর্তে হাসল সে। হাসিটা রানাকে বোকা বানাবার চেষ্টা, একটা হাত বাড়াচ্ছে পিস্তলের দিকে। অন্য হাতে সামলাচ্ছে বোট।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বোটের অবস্থা হলো ডুবুডুবু। একটা ঢেউয়ে নাক ঢোকাতে পাহাড়ের মত উঁচু সবুজ পানি ভেঙে পড়ল ডেকে। মালিকের গুলি সোজা আকাশের দিকে উঠে গেল। রানা তাকে

দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ দিল না। লাফ দিল ও, ওর শরীর যেন দীর্ঘ একটা বল্লম, নিজের সমস্ত ওজন ও ভারের সাহায্যে ছুরিটা গাঁথছে সরাসরি আইএসআই স্পাইমাস্টারের হৃৎপিণ্ডে। অপর হাত দিয়ে মালিকের কব্জিতে কারাতের এক কোপ মারল, ফলে পিস্তলটা উড়ে গেল ডেকের দিকে। শরীর মুচড়ে ছুরিটাকে এড়াল মালিক, যদিও রানাকে ঠেকাতে পারল না। রানার ধাক্কা খেয়ে ফুসফুস খালি হয়ে গেল তার। তবে খালি হাতটায় ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে নিজের ছুরি।

দু'জনেই ওখানে পড়ে আছে, পরস্পরের হাত যেন তালাবদ্ধ, বোট সিধে না হওয়া পর্যন্ত কারুরই নড়ার উপায় নেই। মালিকের ধূসর চোখ রানার কালো চোখে তাকিয়ে আছে।

'তোমার ধারণা ছুরির খেলা এক-আধটু জানো তুমি, না, রানা?' ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে রানার তলপেটে হাঁটু চালাল মালিক। আঘাতটা আংশিক ঠেকাতে পারল রানা, তারপরও ব্যথার তীব্রতা এত বেশি যে বমি পাচ্ছে।

মালিক পুরোটা রাত বিশ্রামে ছিল। রানা ছিল রাস্তায় জেগে। ক্লান্তির মাসুল দিতে হচ্ছে ওকে। শক্তি পরীক্ষায় হেরে যাচ্ছে ও। মালিকের হাত পায়ে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। আঘাতগুলো ঠেকাতেই ব্যস্ত থাকছে রানা, পাল্টা কোন আঘাত এখনও মারতে পারছে না। ও বুঝতে পারছে, দম নেয়ার জন্যে একটু সময় দরকার ওর।

ঢেউ-এর মাঝখানে পড়ে কাত হচ্ছে বোট, উল্টে যায় যায় অবস্থা। এরকম যখন আবার কাত হচ্ছে, মালিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দূরে সরে এলো রানা, দম ফিরে পাবার সুযোগ পেল।

'লং রেঞ্জ উইপনে তুমি ভালই ওস্তাদি দেখাতে পারো, রানা,' বলল মালিক। 'কিন্তু শক্তি পরীক্ষায় সত্যিকার একজন পুরুষের সঙ্গে তুমি পারবে না।'

'মার খেলে বুঝবে সত্যিকার পুরুষ বলতে আসলে কি

বোঝায়,' বলল রানা, হাসিতে মুক্তো ঝরার বদলে অবজ্ঞা মেশানো বার্তা—গো টু হেল। 'আমার পাঠানো উপহারটা পেয়েছ?'

রানার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে মালিক, ছুরিটা নিচের দিকে নামিয়ে ধরে আছে। দু'জনেই পিচ্ছিল ও অস্থির ডেকে সাবধানে পা ফেলছে।

কি করতে পারে এবং করে দেখাবে, রানাকে বিস্তারিত জানাচ্ছে মালিক। তার প্রতিটি বাক্য অশ্লীল ও অশ্রাব্য। শুধু তাই নয়—সুন্দর চেহারা, অভিজাত হাবভাব, তার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, ইউরোপিয়ান সমাজে তার মর্যাদার আসন ইত্যাদির সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানানও বটে।

'তোমাকে ভদ্র সমাজে ফিরতে দেয়া যায় না, মালিক,' বলল রানা।

'তুম সালে...' মুখে খিস্তি, বাগিয়ে ধরা ছুরি নিয়ে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মালিক। যেন একজন বুলফাইটার, সাবলীল ভঙ্গিতে নিজেকে এক পাশে সরিয়ে নিল রানা পা দুটোকে জায়গা বদল না করিয়েই। ওর পাল্টা কোপ, হাতের সামান্য একটা ঝাঁকি মাত্র, মালিকের সোয়েটার ছিঁড়ে ফেলল; বাইরে বেরিয়ে এলো রক্ত মাখা ফলা।

'শ্যাতোয় আমি কিসের খোঁজে গিয়েছিলাম, এখনও তুমি জানতে পারোনি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'পরের বার আশা করব আরও দক্ষ একটা টীম পাঠাবে আইএসআই। এটা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর, এ তোমাকেও স্বীকার করতে হবে। ব্লাডি, ইয়েস। স্মার্ট, নো।'

ছুরি হাতে আবার লাফ দিল মালিক। পাশ কাটিয়ে সরেই রানাও পাল্টা ছুরি মারল। পরস্পরের কাছ থেকে দু'জন যখন পিছু হটল, দেখা গেল দু'জনই জখম হয়েছে। তবে কারও জখমই মারাত্মক নয়।

রানা উপলব্ধি করল, ওর রিফ্লেক্স সামান্য হলেও শ্লথ হয়ে

পড়েছে। ব্যাপারটা মালিকের চোখেও ধরা পড়ে গেছে। হেসে উঠল সে। 'তুমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, হে! দুঃসংবাদই বলব। কারণ, এ আমি সারাদিন চালিয়ে যেতে পারব...'

বুঝতে না দিয়ে, হঠাৎ, ঘ্যাচ্ করে ছুরি মেরেই পিছিয়ে এলো রানা। মালিক বোকা বনে গেছে, বাহুর গভীর ক্ষতটা একহাতে চেপে ধরল।

'আমাকে তুমি দুর্বল আর ক্লান্ত ভেবে তৃপ্তি বোধ করো, এই সুযোগে দু'চার ফোঁটা রক্ত ঝরাই তোমার, ঠিক আছে?' বোট কাত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সুযোগটা কাজে লাগাতে পেরেছে রানা। 'তোমাকে অন্তত একশো একান্নবার খুন করা উচিত আমার, মালিক। বাংলাদেশ বিমানের ওই প্লেনে সব মিলিয়ে ওরা ছিল একশো পঞ্চাশজন। আরও একবার তোমার খুন হওয়া দরকার লাজুলির জন্যে...' লাজুলির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় রানা যেন হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। শূন্যে লাফ দিয়ে ছুরি চালাল সরাসরি মালিকের বুকে। মালিক পিছিয়ে যাবার সময় পেল, কিন্তু হিসাব না রাখায় ধাক্কা খেলো রেইলিঙে। ভারসাম্য তখনও ফিরে পায়নি, আবার দীর্ঘ একটা বল্লমে পরিণতি হলো রানার শরীর, বাড়ানো হাতে ছুরির ফলাটা যেন সেই বল্লমেরই একটা অংশ, ঘ্যাচ করে ঢুকে গেল মালিকের দুই পাঁজরের ফাঁকে। তবে আঘাতটা কতটুকু মারাত্মক বোঝা গেল না। রেইলিঙে পিঠটা ঠেকেই ছিল, পা দুটো শূন্যে উঠে যাওয়ায় একটা মাত্র ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল উত্তাল সাগরে।

রানা তাকিয়ে আছে। ভাবছে, পড়েই ডুবে গেল নাকি! তবে না, সময় একটু বেশি নিলেও সারফেসের ওপর মাথা তুলল মালিক। দেখেই বোঝা গেল তার অবস্থা শোচনীয়। বোটের রেইলিং ধরে দাঁড়ানো রানাকে খুঁজে নিল তার ব্যাকুল, ব্যগ্র দৃষ্টি।

'রানা,' হাঁপাচ্ছে মালিক। 'আমি সাঁতার জানি না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। কিছু লোক একটা বিষয়ে

সাহস দেখাবে, আরেকটায় দেখাবে না। ছুরির লড়াইয়ে কখনোই মালিক প্রাণ ভিক্ষা চাইত না।

'রানা, আমি আমার সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চয় তোমাকে খুশি মনে দিয়ে দেব,' বলল মালিক। 'এমনকি আইএসআই সম্পর্কে যা জানতে চাইবে, সব বলব।'

রানা মাথা নাড়ল, ধীরে ধীরে। 'এত কিছু চাই না, মালিক। এ-সব আমার দরকার নেই। তুমি লাজুলিকে এনে দিতে পারবে?'

মালিক ডুবে যাচ্ছে। স্রোতের বিরুদ্ধে বোটের দিকে এগোনো তার পক্ষে অসম্ভব। ধীরে ধীরে তার দিকে পিছন ফিরল রানা। তারপর ক্লান্ত পায়ে ককপিটে চলে এলো। আবার যখন তাকাল, মালিককে কোথাও দেখতে পেল না।

ককপিট থেকে সিঁড়ি বেয়ে বোটের নিচে নেমে এলো রানা। খুঁজতে হলো না, তালা দেয়া কেবিনের দরজা কাঁধের গোটা তিনেক ধাক্কায় ভেঙে ফেলতেই ওকে দেখে হেসে উঠল তৃষা চৌধুরী। 'আমি ঠিক জানতাম আপনি আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন!' বলেই ছুটে এলো। রানার হাত ধরে বাঙ্কের ওপর বসিয়ে একের পর এক একশো একটা প্রশ্ন। তারপর রক্ত আর ক্ষত দেখে আঁতকে ওঠা। কোমল হাতে ধোয়াধুয়ি, ফুঁপিয়ে উঠে চোখের পানি ফেলা, ব্যান্ডেজ বাঁধা। এসবই খুব পরিচিত ও পুরানো লাগছে রানার। তবে একেবারে নতুন, এবং সত্যি অত্যন্ত মধুর লাগল শুধু একটা জিনিস। তৃষার গলায় শ্রদ্ধাভরা 'ভাইয়া' ডাকটা।

বোট নিয়ে ছোট্ট একটা জেলে পাড়ায় চলে এলো ওরা, জেটিতে রশি বাঁধল সন্ধের খানিক পর। জেলে পাড়ায় ঢুকে নিজের ও তৃষার জন্যে কিছু কাপড়চোপড় কিনল রানা, একটা রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া দাওয়া সারল, সবশেষে ফোন করল সোহেলকে।

সোহেল জানাল মাঝরাতে একটা হেলিকপ্টার এসে জেলে পাড়া থেকে তুলে নেবে ওদেরকে।

ঝড়-বৃষ্টি তো অনেক আগেই থেমে গেছে। রাত আটটার পর

চাঁদ উঠল আকাশে। দীর্ঘ সৈকতে তৃষাকে পাশে নিয়ে হাঁটছে রানা। মা ও বাবা নিরাপদে বাংলাদেশে পৌঁছেছে, সে নিজেও যাচ্ছে, এ-সব নিয়ে যতটা খুশি তৃষা ততটাই কৌতূহলী। বাংলাদেশ কেমন তা সে জানে না। জানবে কি করে, জন্মের পর থেকে পাকিস্তানেই তো বড় হয়েছে। তার প্রশ্নের জবাবে রানা বলল, 'যদি ভালবাসতে পারো–পৃথিবীর সেরা দেশ ওটা। আর যদি হিসাব মেলাতে চাও, কি পাবে আর কি পাবে না–দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ দেশগুলোর একটা।'

'আমি জানতে চাইছি, দেশটা আপনার দৃষ্টিতে কেমন, ভাইয়া?'

'আমি ভালবাসি,' রানার জবাব সহজ ও সংক্ষিপ্ত।

হেসে উঠল তৃষা। 'তাহলে আমিও কি ভাল না বেসে পারব?'

***

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

উড়ন্ত সসার, যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, আমি গুপ্তচর

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভলিউম ও রিপ্রিন্ট বাদে সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষ বর্ধিত কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

জাত গোক্ষুর

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রিয় কোন বন্ধু খুন হয়ে গেলে মাসুদ রানা প্রতিশোধ নিতে চাইবেই। কিন্তু আকার্ডিয়া মারকাসও তো চমৎকার একটা প্ল্যান ধরে গ্রীসের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইছে, এত সহজে কি তাকে ধরা যাবে?

তাছাড়া, শিপিং ম্যাগনেট সালজুনাসকে ব্রাজিল প্ল্যানটেশন থেকে উদ্ধার করবে কে?

কে ঠেকাবে প্রাইভেট আর্মির এথেন্স অভিমুখে যাত্রা?

আর তিন কর্নেলকে খুন করার ষড়যন্ত্র?

সেটার কি খবর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। –কা. আ. হোসেন।

মাহবুব আলম পারভেজ

টি.এন.খানম একাডেমী, মৌলভীবাজার-৩২৫১

আমি সেবা প্রকাশনীর একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে ওঠার পর থেকে সেবা'র সাথে আমার বিস্তর দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর প্রিয় সিরিজগুলো পড়া হয়ে ওঠে না। আমি নিজেই অবাক, কিভাবে আমার মত একজন একনিষ্ঠ পাঠক বইপড়ার প্রতি এমন বিমুখ হল! কেন এই বয়সে এলেই অনেক একনিষ্ঠ বই পড়ুয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলেন? মনে হচ্ছে, প্রমথ চৌধুরীর কথাই ঠিক। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আসলে বই পড়ার সু-অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে। বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন এর জন্য দায়ী – এটা কি ঠিক?

সেদিন উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা উপন্যাসের ভূমিকায় 'মাসুদ রানা'র জন্য খ্যাত হিসেবে আপনার নাম দেখলাম। খুব ভাল লাগল। আচ্ছা, কাজী'দা, মাসুদ রানাকে নিয়ে কি ভবিষ্যতে কোন চলচিত্র হবে, অথবা টিভি সিরিয়াল? বিদেশে যেরকম হয়। ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।

পরিশেষে সেবা'র সকল লেখক, পাঠক-পাঠিকা এবং আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

* আমাদেরও সবার শুভেচ্ছা রইল প্রাক্তন পাঠকের প্রতি। ...বই পড়ার অভ্যাস কোনও কারণে সাময়িক ভাবে যদি ছুটেও যায়, ঘাবড়াবার কিছু নেই; আবার ফিরে আসবে। দেশী বা বিদেশী কোনও সংস্কৃতির আগ্রাসনই একে ঠেকিয়ে দিতে পারবে না – কারণ, এটা মৌলিক চাহিদাগুলোরই একটা।

...চলচ্চিত্র বা সিরিয়ালের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ বোধ করি না। কারণ, করে দেখা গেছে, মন মত হয় না। 'বিস্মরণ' বইটি সিনেমা করেছিলেন মাসুদ পারভেজ, 'পিশাচ দ্বীপ'কে টিভি নাটকে রূপ দিয়েছিলেন স্বনামধন্য একজন নাট্যকার; কিন্তু কোনটাই মানসম্পন্ন হয়েছে বলে দর্শক-স্বীকৃতি পায়নি।

বিহোস

৪০৩/১ মধুবাগ (২য় তলা), ঢাকা-১২১৭

চার্লস ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট' বইটির মাধ্যমে সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে আমার পরিচয়। যখনই আমি হতাশ হয়ে পড়ি তখনই আমার হাতে উঠে আসে অলিভার টুইস্ট। কালকুক্ষি (ইসমাইল আরমান), ভীষণ অরণ্য ১-২ (রকিব হাসান), জাদুর ঘড়ি (টিপু কিবরিয়া), টাইম মেশিন (এইচ জি ওয়েলস) বইগুলো আমি বারবার পড়ি। আমার ধারণা ওই বইগুলোর জন্যই সেবা প্রকাশনী সার্থক।

গতকাল থেকে আমি মাসুদ রানা পড়া শুরু করেছি। ইতোমধ্যে তিন-চারটে বই শেষ করেছি। এর মধ্যে বাঘের খাঁচা ভাল লেগেছে বেশি। আচ্ছা, মাসুদ রানা কি প্রথম থেকে সিরিয়াল ধরে পড়তে হবে, না কি যখন সামনে যেটা পাই পড়লেই চলবে?

* মাসুদ রানায় সিরিয়াল নাম্বার দেয়া হয়েছে কেবল চেনার সুবিধের জন্য। কাহিনী প্রতিটি আলাদা। পড়ার সময়ে সিরিয়াল ধরে পড়তে হবে না। তবে যেসব বই দুই বা তিন খণ্ডের, সেগুলো সিরিয়াল ধরে পড়তে হবে।

মোঃ জুবের হাসান (জেবলু)

জাঙ্গিরাই, জুরী, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার-৩২৫১

আমি সেবা প্রকাশনীর ১৫৫ নম্বর গ্রাহক। গত ৬ মে, ২০০২ ইং তারিখে আমি একটি বাস্তব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমার এই লেখাটুকু যদি মাসুদ রানা সিরিজের আলোচনা বিভাগে ছাপান, তাহলে খুব খুশি হব। আমার লেখাপড়া খুবই কম, মোটর ড্রাইভিং-এর চাকরি করি, প্রিয় হবি বই পড়া। আশাকরি আমাকে অবহেলা করবেন না।

৬ মে আমি চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হই একটি নতুন গাড়ি কেনার জন্য। যখন কুলাউড়া এসে ট্রেনের টিকেট করি তখন ট্রেনের ১ ঘণ্টা বাকি। স্টেশনের বুকস্টল থেকে মাসুদ রানা সিরিজের 'মুক্তিপণ' বইটি কিনে পড়া শুরু করলাম। ওই বইটি পড়তে পড়তেই পৌঁছে গেলাম চট্টগ্রামে। রাত কাটাবার জন্য কনকর্ড নামে এক হোটেলে উঠলাম। সকালে টেলিফোন

করলাম আমার গাড়ির মালিকের বন্ধুকে। আমার মালিক বলেছিলেন চট্টগ্রামে পৌঁছেই ওকে ফোন করলে ও আমাকে রিসিভ করবে।

যাই হোক রাতে আর তাকে কষ্ট না দিয়ে সকালে ফোন করলাম। আমার ফোন করার এক ঘণ্টা পর ওরা দুইজন আসে। একজনের নাম সেলিম, অপরজন আইয়ুব। আমাকে গাড়ি দেখাবে বলে একটা ট্যাক্সিতে তুলল, আমিও উঠলাম। যখন মুরাদনগর পয়েন্ট পার হলাম তখন জিজ্ঞেস করলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছি। সেলিম নামের লোকটি বলল: এই তো, এসে গেছি। এভাবে এই তো, ওই তো বলে আমাকে নিয়ে সোজা ফটিকছড়িতে চলে এলো ট্যাক্সি।

ফটিকছড়িতে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম: ভাই, এখানে আমাকে কোথায় নিয়ে আসলে? গাড়ি কোথায়? ওরা বলল: একটু পর গাড়ি আসবে। মনে হলো আমাকে হয়তো ওরা আটক করে ফেলল। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আমাকে হলুদিয়া রাবার বাগানে নিয়ে আসল। শুনেছি ওই বাগান রাউজান থানায়। এখানে এনে ওরা আমার নাম জিজ্ঞেস করল। নাম বললাম। তারপর আমার কাছ থেকে বইটা নিয়ে অনেকক্ষণ পড়ার পর বলল: তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী।

কথা শুনে আমার দম বন্ধ হয়ে আসল। মনে হলো, আমি বুঝি আর এ জগতে নাই। রাত ৮-১০ মিনিটে বলল: চলো, তোমার মালিকের কাছে ফোন করবে, চলো। এবং আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মালিকের কাছে ফোন করাল এবং আমার 'মুক্তিপণ' হিসাবে দশ লক্ষ টাকা দাবি করল। কথা শুনে আমার মালিক তো হতবাক, বন্ধু যে এতবড় বেইমান হতে পারে বিশ্বাসই করতে পারছেন না। এইভাবে পরপর তিনদিন আমাকে দিয়ে ফোন করায়। এদিকে আমার মালিকও বসে ছিলেন না। উনি অনেক মন্ত্রী-এমপি ধরেছেন, কিন্তু ওরা ছিল ক্ষমতাশালী, প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসী—তাই আমাকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি

পরে ৮ দিনের দিন ওই এলাকার চেয়ারম্যানের সাহায্য নিয়ে দাঙ্গা পুলিশ ও রাউজান থানার ওসি সাহেবের নেতৃত্বে থানার পুলিশ ও হলুদিয়া রাবার বাগানের আনসার ও অত্র ইউপি-র আনসার প্রায় ৫০ থেকে ৭০ জনের একটি টিমের যৌথ অভিযান রাত তিনটা থেকে শুরু হয়। সকাল ১০টার সময় ওরা আমাকে ছেড়ে দেয়। পরে একটি মামলা দায়ের করে আমরা বাড়ি ফিরে আসি।

এই আটটি দিন আমার যে কিভাবে কেটেছে তা সাজিয়ে লেখার ক্ষমতা আমার নেই। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। মাসুদ রানা সিরিজ পড়া ছিল বলে কিছুটা সাহস ছিল বুকে, একেবারে বেসামাল হয়ে পড়ি নাই। আপনার

মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি।

* আপনি যে এতবড় একটা বিপদ কাটিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন, সেজন্য খোদার কাছে হাজার শোকর।

ভাস্বর পাল

৮ম শ্রেণী, খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা।

আমি তিন গোয়েন্দার একজন মুগ্ধ পাঠক। অনেকদিন যাবত তিন গোয়েন্দা বের হয় না বিধায় মাসুদ রানা সিরিজের 'অপারেশন বসনিয়া' ও 'টার্গেট বাংলাদেশ' বই দুটি পড়লাম। কিশোর চিলার আর তিন বন্ধু পড়া বাসি মুখে রানার প্রতিটি কর্মকাণ্ড আমাকে দিয়েছে নতুন এক অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। তারপর শেষ করলাম মাসুদ রানার কিশোর সংস্করণ আচ্ছা, মাসুদ রানার ভেতর থেকে যদি নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারগুলো ফেলে দেয়া যায়, তাহলে ওটাও তো হয়ে উঠতে পারে তিন গোয়েন্দার মত একটি পারিবারিক সিরিজ। তাই না?

আপনার কি মনে হয়?

* তুমি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে এতো চিন্তা-ভাবনা করেছ, এবং একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করেছ, সেজন্য তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু না, আমার মনে হয় আলাদা ধারার দুটি সিরিজ আলাদা থাকাই শ্রেয়। প্রথম দিকে মাসুদ রানায় বেশ কিছুটা খোলামেলা বর্ণনা থাকত, যেহেতু ওটা বড়দের জন্য লেখা সিরিজ। কিন্তু তোমার বয়সী ছেলেমেয়ে (এখন অবশ্য তাদের কারও বয়স সাতচল্লিশের কম না!) এতই মজা পেয়ে গেল ওতে, এবং বই হাতে অভিভাবকদের কাছে ধরাও পড়তে থাকল যে, দেশময় হৈ-হৈ আওয়াজ উঠল গেল, গেল, ছেলেমেয়েরা সব রসাতলে গেল।

আমিও দেখলাম, কথাটা একেবারে অমূলক নয়। নিষেধ করলেও তোমরা শুনবে না। তাই খোলামেলা বর্ণনা একদম বাদ দিয়ে দিলাম এ সিরিজ থেকে। এতে বড়দের জন্য মজাদার একটা সিরিজের বেশ কিছুটা অঙ্গহানি হলো–কিন্তু কিছু করার নেই।

এখন যে-কোনও বয়সের মানুষ এ-সিরিজ পড়তে পারছে বটে, কিন্তু বড়দের কাহিনী তো বড়দের বিষয় নিয়েই হবে, একে কোনদিন কিশোর সাহিত্য বলা যাবে না। মাসুদ রানাকে দিয়ে কখনও তিন গোয়েন্দার মত সাইকেলে চেপে গোয়েন্দাগিরি করানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তিন গোয়েন্দাকে দিয়ে মৃত্যুর পরোয়া না করে দুর্ধর্ষ এসপিওনাজের কাজ করানোও সম্ভব নয়। দুটো সিরিজ সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৯/১০/'০২ যমজ ভূত (কিশোর থ্রিলার/প্রজা.) রকিব হাসান

বিষয়: কালো হয়ে এল আকাশ। বাতাস কনকনে। কুখ্যাত কবরস্থানের পুরানো পাথরগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে চললাম। বিশাল কবরটা চোখে পড়ল। এক কবরের দুই ফলক। দুই জনের নাম। নিচে একটা পাখির ছবি আঁকা, কাকের মত দেখতে। তার নিচে লেখা: আমাদের শান্তি ভঙ্গ করতে চাইলে করো, কিন্তু তারপর যা ঘটবে তার জন্যে নিজেরাই দায়ী থাকবে।

১৯/১০/'০২ অ্যাক্রস দ্য পিরেনীজ (কি. ক্লাসিক/প্রজা.) রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী শাহনূর হোসেন

বিষয়: অপহরণ করা হয়েছে হোসে ফার্ডিনান্ডের একমাত্র কন্যা কর্নেলিয়াকে। হোসে ফার্ডিনান্ডের সন্দেহ, প্রতিদ্বন্দ্বী গুইশাম্পোর ছোট ছেলে কোয়ামোদো অপকর্মটার হোতা। এদিকে, স্পেনের বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে লেখা ফ্রান্সের ডিউক অর্লিয়াঁর গুরুত্বপূর্ণ চিঠি নিয়ে এসেছে চার্লি সাভানা। তাদের উদ্দেশ্য, অবৈধ শাসকের হাত থেকে রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সত্যিকার রাজার হাতে ফিরিয়ে দেয়া। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হোসে ফার্ডিনান্ডের আশা, তাঁর মেয়েকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে আনবে চার্লি সাভানা। সাভানা কি তাঁর আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে?

আরও আসছে

২৮/১০/'০২ রহস্যপত্রিকা (১৯ বর্ষ ১ সংখ্যা) নভেম্বর, ২০০২
৪/১১/'০২ সরাইখানায় ষড়যন্ত্র (তিন গোয়েন্দা/কি. থ্রিলার) রকিব হাসান
৪/১১/'০২ নীলিমায় মেঘ (সেবা রোমান্টিক) গোলাম মাওলা নঈম

মাসুদ রানা

মৃত্যুবীজ

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাঙ্গালী বিজ্ঞানী ফারুক চৌধুরী এমন কিছু আবিস্কার করেছেন যা দুনিয়ার মানুষের জন্যে আশীর্বাদ। তবে তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কারটি হতে পারে ভয়াবহ অভিশাপ। প্যারিসে শুরু হল বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী স্পাই নেটওয়ার্কের মধ্যে তীব্র মরণপণ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানীর মেয়ে তৃষা চৌধুরীকে কে কার আগে খুঁজে বের করতে পারে।
তৃষাকে পেয়েও হারাল মাসুদ রানা, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লাজুলির প্রশ্নের জবাব দেয়া হল না।
ও কি ভেবেছিল বিজ্ঞানীকে উদ্ধার করে আনার জন্য এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেখান থেকে আজ পর্যন্ত ফিরে আসতে পারেনি কেউ!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০